দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

প্রাচীন ভারতের প্রতিভাকে উপেক্ষা করেছে আধুনিক বিশ্ব
— পৃঃ ৩১

স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিস্টদের দেশভক্তির নাটক
— পৃঃ ৩৫

৭৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ৩০ আগস্ট, ২০২১ ।। ১৩ ভাদ্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৩০ আগস্ট - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মমতার ‘মুখ ও মুখোশ’ ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মানুষের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে রাজ্য করোনামুক্ত ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতায়, বিপন্ন মানবিকতা ☐ সুজন চিনয় ☐ ৮

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি? ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

বিচারের বাণী কঠোর হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিষ্ফলা ☐ সুজিত রায় ☐ ১১

ভোট-পরবর্তী হিংসার তদন্তে সিবিআই ☐ জাহ্নবী রায় ☐ ১৩

তালিবান এই দেশে কতটা ক্ষতিকর ☐ সুকল্প চৌধুরী ☐ ১৪

করোনা বিধি শিকেয় তুলে দুয়ারে সরকার ☐ চন্দ্রভানু ঘোষাল ☐ ১৬

মমতাকে রোমান চার্চের আমন্ত্রণ, কৌতূহল সর্বস্তরে ☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ১৭

প্রাচীন কাব্যে কালিদাস ☐ সরোজ ভট্টাচার্য ☐ ২০

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ২৩

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ☐ মহন্ত যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ ☐ ২৫

দুই মা এক সন্তান ☐ অনন্যা চক্রবর্তী ☐ ২৮

ভ্রমর কইয়ো তারে গিয়া ☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ২৯

প্রাচীন ভারতের প্রতিভাকে উপেক্ষা করেছে আধুনিক বিশ্ব ☐ প্রোজ্জ্বল মণ্ডল ☐ ৩১

ধোলাভিরাম সিন্ধু সভ্যতার নতুন দিগন্ত ☐ কৌশিক রায় ☐ ৩৪

স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিস্টদের দেশভক্তির নাটক ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩৫

অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই শুকদেব থাপারকে হত্যা করেছিল ইংরেজরা ☐ ডাঃ আর এন দাস ☐ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় তালিবানি শাসনই চলছে ☐ ড. দীপ্তাস্য যশ ☐ ৪৩

মানুষকে ভিখারি বানাবার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি মাননীয়া! ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৫০

প্রকাশিত হবে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দাড়িভিট ভাষা আন্দোলন

সাধারণ বাঙ্গালি ভাষা আন্দোলন বলতে ওপার বাঙ্গলা বোঝে। যারা একটু বেশি খোঁজখবর রাখেন তারা ওপার বাঙ্গলার সঙ্গে শিলচরকেও জুড়ে দেন। কিন্তু ২০১৮ সালে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে যুক্ত হয়েছে আরও একটি নাম— দাড়িভিট। এই আন্দোলনকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ গুলি চালায়। মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মন নামে দুই ছাত্রের। এবছর সেই ঘটনার তৃতীয় বর্ষপূর্তি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে দাড়িভিট ভাষা আন্দোলন নিয়ে নানা অজানা তথ্য।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জয়তু শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতির পথপ্রদর্শক। ভারতে সীমানা ছাড়িয়া পৃথিবীর দেশে দেশে তাঁহার আরাধনায় মানুষ মাতিয়া উঠিয়াছে। দেশে দেশে তাঁহার বাণী ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণনামে মানুষ শান্তির পথের সন্ধান পাইয়াছে। ভারত ইতিহাসে তিনি নেতৃত্ব দানকারী একজন রাজপুত্র ও রাজা। ভগবদ্গীতায় তিনি পথপ্রদর্শক। মহাভারতে তিনি কূটনীতিজ্ঞ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের রথের সারথি। ভক্তকুলের নিকট তিনি একাধারে শিশুদেবতা, আদর্শ প্রেমিক, দিব্য নায়ক এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁহার সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য রহিয়াছে মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে। ভাগবতপুরাণের এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে তাঁহার এবং তাঁহার ধর্মোপদেশের স্তুতিকথা। ইতিহাস অনুসারে তিনি ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হন। তাঁহার এই ধরাধামে আবির্ভাবের দিনটি সারা বিশ্বের কৃষ্ণভক্তদের কাছে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে যখন দুষ্টশক্তির নিকট মানবতা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত, তখন সেই দানবীয় শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতিকে রক্ষা এবং শুভশক্তির পুনপ্রতিষ্ঠা করিয়া আদর্শ পুরুষ রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন— 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ । পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্মস্থপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' তাঁহার আবির্ভাবের দিনটিকে সারা বিশ্বের কৃষ্ণভক্তরা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। বিদেশিরাও আজ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সনাতন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক পুরুষ। পৃথিবীর প্রাচীনতম সহিত্য ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ ও ১১৭ সূক্তে ঋষি কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। শাস্ত্রবেত্তাগণ তঁহাকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কেননা, গীতাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন তাঁহারা দুইজনে দ্বাপরের পূর্বেও বহুবার আবির্ভূত হইয়াছেন এবং মানবজাতিকে সত্যপথে রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন। দ্বাপরে তিনি অর্জুনের মাধ্যমে গীতার আঠারোটি অধ্যায়ে জাগতিক জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম, বিভূতি, ভক্তি, মোহ, মায়া, যশ-খ্যাতি, ন্যায়-অন্যায়, অসত্য, অহংকার, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবজাতিকে তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে দুষ্টশক্তি আবার মাথা তুলিয়াছে। জঙ্গিবাদ বিশ্বের মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই দুঃসময়ে ভগবান কৃষ্ণের ন্যায় নেতৃত্ব ও তাঁহার বাণীর প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান কৃষ্ণের স্মরণ, মনন এবং তাঁহার উপদেশের কার্যান্বয়নই রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষের একান্ত করণীয়। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে স্বস্তিকা পত্রিকা যাত্রা শুরু করিয়া ৭৩ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্র চেতনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবাসীকে শক্তি প্রদান করুন। জয়তু শ্রীকৃষ্ণ।

সুভাষিতম্

নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষু নাস্তি সত্য সমং তপঃ।

নাস্তি রাগ সমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগ সমং সুখং।।

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, ক্রোধের মতো দুঃখ নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই এবং ত্যাগের সমান সুখ নাই।

মমতার 'মুখ ও মুখোশ'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন : বিজেপির বিরুদ্ধে ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাজোটের মুখ না মুখোশ? আপাতত নির্বাচনোত্তর হিংসা নিয়ে হাইকোর্টের রায়ে তাঁর মুখোশ খসে গিয়েছে। তার সরকার ও দলের বিরুদ্ধে সিবিআইআর 'সিট'-এর দ্বিমুখী তদন্ত শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দল তদন্তে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। অগ্রাহ্য বা ফেলে দিতেও পারছে না। খানিকটা ছুঁচো গেলার অবস্থা।

তবে মহাজোট নিয়ে তাঁর বক্তব্য 'মুখ না মুখোশ' তা পরে জানা যাবে।

মমতা জানিয়েছেন তিনি 'পহলে আপ, পহলে আপ' থিয়োরি-তে বিশ্বাসী নন। তাই আগেভাগে ঘোষণা করেছেন অন্য যে কোনও মুখ নিয়েই তিনি দেশজুড়ে 'বিজেপি হটাও' লড়াইয়ে রাজি। অনেকের কাছে এটা একেবারেই বিশ্বাস্যযোগ্য নয়। আমিও খানিকটা সন্দিহান। কারণ অনেকটা বাধ্য হয়েই সোনিয়া গান্ধী ১০ বছর আড়াল থেকে দেশ চালিয়েছিলেন। এটা সবাই জানেন যে মমতা সোনিয়া নন। তাই সন্দেহ থেকেই যায়। এ ধরনের রাজনৈতিক সন্ন্যাস আজকের দিনে ব্যতিক্রম। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে এরকম উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিল। এখন তা অসম্ভব।

আমার ধারণা এবারে মমতার আসল জোটসঙ্গী ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে প্রশান্ত তাঁকে জিতিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে প্রশান্ত শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন। এটাও শোনা যাচ্ছে যে কিশোরের আই-প্যাক সংস্থা এখন রাজ্য চালাচ্ছে। মমতা তিন ভাগে কাজ ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর ত্রিমুখী কর্মসূচি। আই-প্যাক রাজ্য চালাবে। তাঁর ভাইপো ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত ১০টি রাজ্যে তৃণমূলের গোড়াপত্তন করবেন আর তিনি মোদী হটাও কর্মসূচিতে দেশ জুড়ে মহাজোট তৈরি করবেন। ১৯৯৮-এ কংগ্রেস ভেঙে মমতা তৃণমূল গড়েছিলেন। মনে হয় সোনিয়া গান্ধী আজও তা মেনে নিতে পারেনি। তার জীবনীতে মমতা লিখেছেন তৃণমূল গড়ার বিরুদ্ধে সোনিয়াই প্রধান বাধা ছিলেন। কীভাবে সে বাধা উতরে ছিলেন তিনি তা লিখেছেন।

তাই 'কুইন মাদার'-কে হাতে রাখতে প্রশান্ত আসরে নেমেছেন। মমতা তার দুর্বলতা জানেন। দেশের যা ভোট চিত্র তাতে কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে এগোনো পাগলামি। লোকসভার ৫৪৩ আসনের মধ্যে ২০৪ আসনে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই। এই আসনে মমতার মতো আঞ্চলিক দলের কোনও অস্তিত্ব নেই। যদিও কংগ্রেসের ৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে জয় মাত্র ৬টি আসনে। ৪৬ আসনে কংগ্রেস জেতে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

জোট রাজনীতিতে মমতা চিরকাল পটু। ১৯৯৮-এ তাঁর দল তৃণমূলের জন্ম থেকে তিনি জোট করে এসেছেন। প্রথমে বিজেপি, পরে কংগ্রেস। এখন অবশ্য বিজেপি তার প্রধান শত্রু যদিও 'দিদি-মোদি' সেটিঙের একটা অবিশ্বাস্য গল্প ক্ষয়িষ্ণু বামেরা প্রায় ঠাকুমা বা ঠানদির রূপকথার গল্পের মতো ভিত্তিহীনভাবে আউড়ে যান।

২০১১-র মাঝামাঝি থেকে তিনি একা চলছেন। রাজ্য রাজনীতিতে সফল হলেও এটা বলাই বাহুল্য যে জাতীয় রাজনীতিতে তিনি একেবারেই ফেল। মমতা দমে যাওয়ার পাত্রী নন। তাই বিজেপিকে আটকাতে অন্যদের সঙ্গে প্রায় অবলুপ্ত সংসদীয় বামপন্থীদের সঙ্গে নিতে আপত্তি নেই মমতার। বামপন্থীদের আম ছালা সব গিয়েছে। এখন তারা কুল গোত্রহীন। ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটে ১৪৮ আসনের মধ্যে ১২৯টিতে তাদের জামানত জব্দ হয়ে মমতার দিকেই চলে গিয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে মহাজোট গড়তে ব্যর্থ হন মমতা। ভোটে তাঁর ২১ পার্টির জোট ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিজেপি ৩০৩ আসন পেয়ে সংসদে জাঁকিয়ে বসে। তাই ২০২৪-এর জন্য আগেভাগেই কোমর বাঁধছেন। এর পিছনে রয়েছে ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের জয়।

তবে প্রথমেই ওই ২১ ফুলের মালা ৩টি ফুল ঝরে গিয়েছে--- অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি, শরদ পাওয়ারের জাতীয় কংগ্রেস দল আর অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী দল। ২০২১-এ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। মমতার সঙ্গে কংগ্রেস থাকায় নিশ্চুপে ডুব দিয়েছেন অখিলেশ। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ফুটো নৌকো। তাই তার ছায়া মাড়ানো যে পাপ অখিলেশ তা ভালোভাবে জানে। ফলে সে নিঃশব্দে সরে গিয়েছে। আগামীতে আর কে কে সরেন সেটাই দেখার। তখন বোঝা যাবে মমতার কথা 'মুখ না মুখোশ'।

(লেখক প্রাক্তন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মানুষের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে রাজ্য করোনামুক্ত

মাননীয় মা লক্ষ্মীরা,

আজ কোনও ঠিকানা লিখলাম না। আপনারা তো সর্বত্রই আছেন। আপনাদের খালি কয়েকটা কথা মনে করাতে চাই।

ভোটের আগে দিদি বলেছিলেন, সব গৃহবধূদের তিনি হাত খরচা দেবেন। তখনই আমার মনে প্রশ্ন এসেছিল, তাহলে রাজ্যটার কি সত্যই অলক্ষ্মীর দশা? মা, বোনেদের হাত খরচের টাকাও দিতে হবে সরকারকে। যেমন সন্তানদের মৃত মা-বাবার সৎকারের জন্য সরকার টাকা দেয়। সহমর্মী না কী যেন একটা প্রকল্পটির নাম। হায় রে, বাঙ্গালি ছেলেমেয়েদের এমন দুরবস্থা কবে হলো যে বাবা-মায়ের সৎকার করার টাকাটুকু নেই! না, গরিব মানুষ আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ছোটো থেকে দেখে এসেছি, এমন পরিবারের পাশে চিকিৎসা থেকে বিয়ে, সৎকার ইত্যাদিতে প্রতিবেশীরাই এগিয়ে আসেন সাহায্য নিয়ে। কিন্তু এ কেমন দিন এল? প্রতিবেশীদেরও সেই সামর্থ্য নেই।

যাক সে কথা। আপনার আমার টাকাই সরকার নিজের নাম কেনার জন্য দিচ্ছে যখন দিক। কিন্তু তাতেই বা এত ছল-চাতুরি থাকবে কেন? বাঙ্গলায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। নানা মহলের অনেকেই এটিকে তৃণমূলের 'কাটমানি' আদায়ের নতুন কায়দা বলে কটাক্ষ করেন। প্রসঙ্গত রাজ্যের ঘোষণা মতো, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে গৃহবধূরা মাসে ৫০০ টাকা করে পাবেন। তফশিলি জাতি এবং জনজাতিভুক্ত গৃহবধূদের ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ ১ হাজার টাকা। ২৫-৬০ বছর বয়সের মহিলারা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে স্থায়ী সরকারি চাকরিরত, পেনশনভোগী, স্বশাসিত সংস্থা, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মী এবং যে সব শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা স্থায়ী বেতন বা পেনশন পান, তাঁদের স্ত্রীরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন না। কিন্তু কেন? দিদি তো বলেছিলেন, সব গৃহবধূরাই পাবেন টাকা। তৃণমূলের ইস্তেহারেও তাই বলা ছিল। কিন্তু মিলিয়ে দেখুন, ভোটের আগে তৃণমূলের ইস্তাহারে যা বলা হয়েছিল তার সঙ্গে এই প্রকল্পের কোনও মিল নেই। রাজ্যের ১ কোটি ৬০ লক্ষ পরিবারের মহিলাদের সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল। তাতে ৫ কোটি গৃহবধূর এই প্রকল্পের আওতায় টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

যাক, যাঁদের পাওয়ার কথা তাঁরা তো পান। কিন্তু সেটাও কি ঠিকঠাক হচ্ছে? কোথাও তৃণমূল নেতারা রাতের অন্ধকারে গ্রামে ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ। কোথাও আবার সরকারি শিবিরেই নাকি দেওয়া হচ্ছে মূল আবেদনপত্রের ফটোকপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘোষণা করেছেন 'দুয়ারে সরকার' শিবির ছাড়া আর কোনও জায়গা থেকে সরকারি প্রকল্পের ফর্ম দেওয়া বা নেওয়া যাবে না। সরকারি নির্দেশিকাও তাই। তার পরেও বিভিন্ন জায়গায়, নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। তারপরে বেছে বেছে শুধু তৃণমূলের লোকেদের ফর্ম দেওয়া হচ্ছিল। বিনিময়ে ৫০০ টাকা করে দিতেও হয় মহিলাদের। এর ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। ফোটো কপি মানে জেরক্স জমা দিলে তো একই নম্বরের ফর্ম একাধিক ব্যক্তির কাছে থাকবে। তখন সমস্যা হতেই পারে।

আরও আছে। কদিন আগেই শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব মানে রাজ্যের মন্ত্রী একটি ক্যাম্প থেকে একজনকে ফর্ম ফিলাপ করে টাকা নেওয়ায় হাতেনাতে ধরেন ও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেই ক্যাম্পের বাইরে অতীন্দ্র মজুমদার, নবাব রায় চৌধুরী ও অপর্ণা রায় চৌধুরী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ করিয়ে দিয়ে প্রতি ফর্ম পিছু টাকা নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে।

আরও উদাহরণ দেব না। তবে মাসে ৫০০ টাকা পাওয়ার জন্য, বড্ড ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন মা, বোনেরা। ভোর ৪টে ৫টা থেকে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। সেই লাইনে না আছে কোনও শারীরিক দূরত্ব, না আছে মানুষের মুখে মাস্ক। যেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে পরপর লকডাউন বিধি মানার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নাম নথিভুক্ত করতে আসা মানুষদের তার কোনও বালাই নেই। নজর নেই প্রশাসনের। সুতরাং, সাবধানে লাইন দিন। ফর্ম তোলা নিয়ে লাইনে হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, পড়ে যাওয়ায় অনেকেই আহত হয়েছেন। সুতরাং, সাবধান।

আর একটা কথা। মা-লক্ষ্মীরা একবার ভাবুন, আপনার স্বামী বা সন্তান কেন মাসে এই ৫০০ টাকা হাত খরচ আপনাকে দিতে পারেন না? ▯

অতিথি কলম

সুজন চিনয়

আফগানিস্তানে ক্ষমতায় তালিবান
বিপন্ন মানবিকতা

কয়েকটি দেশ (কেউ কেবলমাত্র কুমতলবে) প্রারম্ভিক স্বীকৃতি দিলেও নবগঠিত উগ্রপন্থী তালিবান সরকারকে বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে পা মেলাতে গেলে নিজেদের বদলাতে হবে। এতদিনে টিভির পর্দায় সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছেন কী দ্রুততায় ও অতর্কিতে তালিবানরা গোটা আফগানিস্তান দখল করে ফেলল। তাদের ১৯৯৬ সালের ক্ষমতা দখলের চেয়েও এটি দ্রুততর। মনুষ্যত্বের এক অবর্ণনীয় ট্র্যাজেডির কাহিনি ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকল। সারাদেশ আতঙ্কে ডুবে গেছে। তালিবানি শাসকদের নির্মমতা থেকে বাঁচতে হাজার হাজার আফগান দেশ ছাড়ছেন। তাদের সীমান্তবর্তী দেশগুলো তাদের আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তারা আকাশপথে পালাবার পথ ধরছেন। এই সূত্রে কাবুল বিমান বন্দরে একটি মার্কিন যুদ্ধ বিমানের পেছনে মানুষের উন্মাদগ্রস্ত দৌড় মর্মভেদী। পরবর্তী সময়ে প্রাণ বাজি রেখে যারা উড়ন্ত বিমান থেকে ঝুলছিলেন তাদের বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটে। বিশ্ববিবেককে নাড়া দেওয়ার পক্ষে এমন দৃশ্য বিরল। ক্ষমতাসীন আফগান সরকার ও তার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। প্রেসিডেন্ট গনি ও গুরুত্বপূর্ণ নেতারা দেশ ছেড়ে পালান। হামিদ কারজাই বা আবদাল্লা তাদের তালিবানদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য থেকে গেছেন। আমেরিকা ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানে বহু অর্থ, সম্পদ ও সেনাকে হারিয়েছে। চলেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের আদি কারণ ছিল ৯/১১-র নিউইয়র্কে টাওয়ারে বিমান হানা। সে সময় উদ্দেশ্য ছিল তালিবানদের মদতে গড়ে ওঠা আল কায়দার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা।

সেই লক্ষ্য পূরণ করতে বিশেষ দেরি হয়নি। একই সঙ্গে আরও বড়ো একটি সাফল্য— পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ঢুকে সন্ত্রাসবাদী মাস্টার মাইন্ড ওসামাবিন লাদেনকে নিকেশ করা। এর পরেই মার্কিন নীতিতে দোলাচল দেখা দেয়। সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পালটা সন্ত্রাসী তৈরি করে লড়াই চালানো একই সঙ্গে তাদের ধ্বংস করতে কাউন্টার এমারজেন্সি-কে মদত দেওয়া। পর পর চার চারজন রাষ্ট্রপতি এলেও আমেরিকার আফগান নীতি ছিল বরাবর অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে মার্কিন সেনার উপস্থিতি বার বার মার্কিনি রাজনীতিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা সম্মানের সঙ্গে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা খুঁজছিল। আবার আফগান উন্নয়নে ইতিমধ্যে যে কোটি কোটি ডলার আসছিল তা পকেটস্থ করতে কায়েমি স্বার্থ তৈরি হয়েছিল। বহু অসৎ এনজিও ঠিকেদারের দল এই ব্যবস্থায় রসেবশে ছিল।

আজকের তারিখে কিন্তু চীন ভূ-রাজনৈতিক ভাবে আমেরিকার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীশক্তি হিসেবে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ২০০১ সালে ইউএসএ সারা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি একজোট হওয়ার ঘোষণা করে আফগানিস্তান থেকে সামরিক নজর সরিয়েছিল। তারা ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ার মতো দেশেও সন্ত্রাসবাদ দমনের চেষ্টা শুরু করে। তাতে মিশ্র সাফল্য এসেছিল। কিন্তু এই সমস্ত দেশগুলিও যে সন্ত্রাসী তৈরির পরীক্ষাগার তা বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন আমেরিকা কৌশলগত ক্ষেত্রে চীনকেই নিজের প্রধান প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবেই গণ্য করছে। প্রমাণ হিসেবে পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করতে চীন শক্তি প্রদর্শন শুরু করায় আমেরিকা নিজের স্বার্থেই নড়েচড়ে বসছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ খোঁজা শুরু হয়েছে।

অতি সম্প্রতি চীন তাইওয়ানের ওপর

সাঁড়াশি চাপ সৃষ্টি করছে যাতে তারা চীনের তাঁবেদারিতে থাকে। এখানেও ইউএসএ-কে নজর দিতে হবে। এইসব নানা কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য সুদূর আফগানিস্তানে বিপুল সামরিক উপস্থিতি ও তজ্জনিত খরচ বহন করা আমেরিকার পক্ষে ক্রমশ যুক্তিহীন হয়ে পড়ছিল। শুধু তাই নয়, তাদের উপস্থিতির বিনিময়ে আমেরিকানদের বড়ো একটা অংশের মত ছিল তাদের পাওনা শূন্য। অন্যদিকে যথাযথভাবে চীনের সঙ্গে ইন্দো-পেসিফিক অঞ্চলে শক্তি পরীক্ষা ও চাপ বলবৎ রাখতে গেলে অন্য ফ্রন্ট কমাতে হবে। চীন বিষয়টা খুব ভালোই জানত। তারা খুব চালাকি করে তালিবান নেতা মোল্লা আবদুল গনিবরাদরকে ডেকে আগেই এক প্রস্থ আলোচনা করেছিল। চীনের চরম দু'মুখো নীতিতে নিজের দেশে 'উইঘুর' মুসলমানদের ওপর তারা নৃশংস অত্যাচার চালায়। অনেকেই এর ফলে পালিয়ে বাঁচতে চায়। উইঘুররা যাতে আফগানিস্তানে ঢুকে চীনের বিরুদ্ধে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন না সংগঠিত করতে পারে তার জন্য সাবধান করে দিতেই এই চাল। অর্থাৎ তালিবানি মুসলমানদের অন্যদেশে অত্যাচার করতে মদত করা হবে কিন্তু নিজের দেশে মুসলমান খুন করা হবে। এই কারণেই সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের বিদেশমন্ত্রক আশা প্রকাশ করে বলেছে— তারা বর্তমান আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক চায়। তারা বুঝেছে তালিবানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে আখেরে লাভ আছে।

অন্যদিকে চীনের খুব ভালোই খেয়াল আছে যে একবার আমেরিকা দীর্ঘদিনের আফগান কাঁটা গলা থেকে বার করতে পারলে চীনের সঙ্গে আগে বলা ইন্দো-পেসিফিক-এ কড়া টক্কর দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাদের হাতে মালমশলাও বেশি পাবে। এই কারণেই আফগানিস্তানের নব দখলকারী তালিবান সরকার যদি চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে তা আদৌ বিস্ময়কর নয়। কাবুলের নতুন সরকার চীনকে সেখানে অর্থনৈতিক লগ্নি করতে আহ্বান জানাবে। চীনও পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে দ্রুত ইরানে পৌঁছতে আফগানিস্তানকে ব্যবহার করবে। এই যোগসূত্র তৈরি করা তাদের পক্ষে জরুরি।

১৯৯৬ সালে তালিবানি শাসন প্রথম পত্তন হওয়ার পর সৌদি আরাবিয়া, ইউএই এবং পাকিস্তান তৎক্ষণাৎ তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। এবারও তালিবানি সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই পাকিস্তান বিদ্যুৎগতিতে তাদের স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন আফগানরা এতদিনে 'দাসবৃত্তি থেকে মুক্তি পেল'। কথাটা রাষ্ট্রপতি বাইডেনের কানে কিন্তু মধুর হবে না।

অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের পরিমণ্ডলে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও বর্তমানে রোটেশান পদ্ধতিতে সভাপতি ভারত প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'সমস্ত রকমের হানাহানি যেন এখুনি বন্ধ হয়। আফগানিস্তানে সব ধরনের মানুষকে নিয়ে সরকার যেন 'ইউনাইটেড ইনক্লুসিভ অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ' হয়।'

জাতি সঙ্ঘের পক্ষে ভারত আরও বলেছে, দীর্ঘ ২০ বছরের কিছুটা খোলামেলা পরিবেশে নারী শিক্ষা ও সর্বক্ষেত্রে এমনকী প্রশাসনেও তাদের যোগ দেওয়ার যে স্বাধীনতা ঘটেছে তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। আজকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেন তীক্ষ্ণতম সমালোচনার মুখে পড়েছেন তাঁর দ্রুততম সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া ও পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তান জুড়ে মানুষের হাহাকারকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আফগানিস্তানে এমন একটি একগুঁয়ে অংশের বড়ো প্রজাতি রয়েছে যারা সুপ্রাচীনকাল থেকেই বহির্বিশ্বের কোনো প্রভাব তাদের কট্টরবাদী নীতির ওপর পড়তে দিতে চায়নি। এমন একটি অঞ্চলে 'nation build' করতে যাওয়ার মার্কিনি প্রচেষ্টার মূলেই সমস্যার বীজ ছিল। আফগানরা এটাকে নিজেদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকলেও আগ্রাসন বলেই মনে করে এসেছে।

এখন ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে পরিকাঠামো নির্মাণ ও অন্য প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পর এই পত্রপাঠ ফিরে যাওয়ার প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশের ওপর কেমন হবে? মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে পড়লে আমেরিকার নিজের আরোপ করা মানবাধিকার রক্ষা করার শর্তগুলিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। আজকে সমগ্র বিশ্বের ওপর সুপার পাওয়ার হিসেবে একটা আলগা সমঝোতা রাখা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। উঠে আসছে বজ্রমুষ্টি চীন। হয়েছেও তাই, রাশিয়া ও চীন উভয়েই তালিবানি সরকারকে তড়িঘড়ি স্বীকৃতি দিয়েছে। নারী স্বাধীনতা রক্ষা ও সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তারা কতটা উদাসীন এই স্বীকৃতি তারই প্রমাণ। ইরান ও তুরস্ক ইতিমধ্যেই আমেরিকার ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণে তৎপর।

অন্যদিকে রয়েছে পাকিস্তান যারা সরাসরি ও গোপনে সেই বামিয়ানবুদ্ধ ধ্বংসের সময় থেকেই দীর্ঘদিন তালিবানদের সমর্থন দিয়ে আফগানিস্তানকে একটি জঙ্গি তৈরির প্রশিক্ষণাগার করে রেখেছিল। মূলত পাখতুনরাই অধিক সংখ্যায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিত। এদেরই পাকিস্তান পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে ভারতে ঢুকিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস চালাত। এটাই ছিল পাকিস্তানের ৭১-এ হারের পর ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। যে কারণেই উৎফুল্ল ইমরান তালিবানদের পাশে তাঁর কুমতলব আরও শক্তপোক্ত করার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে হতমান আমেরিকা তার পাকিস্তান নীতিকে কোন খাতে নিয়ে যায় সেটাও দেখার। আমেরিকার ভালোই জানা আছে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের দহরম মহরমের কথা। এই পটভূমিতে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তির দু' বছরের মাথায় ভারত জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি দমন করে, নির্বাচন করিয়ে যে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে এনে গোট বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার ওপর পাকিস্তান তালিবান মাধ্যমে আবার সক্রিয় আঘাত হানতে পারে। ভারতকে অতি সতর্ক থেকে কাশ্মীরে কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করতেই হবে।

(লেখক একজন প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি?

মধ্য কলকাতার বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত একটি থানা গ্রেপ্তারির নামে কীভাবে হেনস্থা করেছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌলতে শুধু বাঙ্গলা কেন, গোটা ভারত তা দেখেছে। শিয়ালদহ-সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার অঞ্চলে সজল ঘোষ জনপ্রিয় নেতা। 'দেবুদা' নামে সবাই একডাকে তাঁকে চেনে। বিশেষ করে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার দুর্গাপূজা আয়োজনের দরুন, ও জেএন রায় হাসপাতালের প্রশাসন পরিচালনার জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা ইদানীং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক সূত্রেও তাঁর রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। তাঁর বাবা প্রদীপ ঘোষ কলকাতা পৌরসংস্থার একাধিকবারের কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদও হয়েছিলেন। তবে কেবল পিতৃ-পরিচয়ের সুবাদে সজল ঘোষ রাজনীতি করেননি। তিনি এককালের জনপ্রিয় ছাত্রনেতাও বটে। সেই সময় 'হাতে মাথা কাটা' সিপিআইএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে হাতেগোণা কলেজের ছাত্র-সংসদ বিরোধী সংগঠনের হাতে ছিল, তার মধ্যে আর্মহারস্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজ ও শিয়ালদহের বঙ্গবাসী কলেজ উল্লেখযোগ্য। আর এই দুই কলেজেই সজল ঘোষের নেতৃত্বে বিরোধীরা ছাত্র-সংসদ নিজেদের দখলে রেখেছিল বছরের পর বছর। একথাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, অনিন্দ্য রাউতের মতো আজ যাঁরা তৃণমূলের নেতা, তাঁরা সজল ঘোষের ছাত্র আন্দোলনেরই ফসল। তিনি কার্যকরী সভাপতি থাকাকালীনই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা জুড়েই সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

এখন কথা হচ্ছে, এককালের কোনো ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে গুন্ডামি করার কোনো অভিযোগ থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু তা বলে ফুটফুটে দিনের আলোয় পদাঘাত করে দরজা ভাঙবে? এটা কোনো সুসভ্য দেশের গণতন্ত্রে হয়? তাও আবার বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে যেখানে আমরা গর্ববোধ করি! তার যে নমুনা সেদিন কলকাতা পুলিশ দেখালো, তাতে যেকোনো সভ্য দেশের মাথা লজ্জায় হেঁট হওয়ার কথা। আর 'সবক শেখানো'র নমুনা দেখানোর জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াকেও ডেকে আনলো! যাতে বিরোধীদের কাছে স্পষ্টতই এই বার্তা দেওয়া যায় যে, শাসক দলের বিরোধী হলেই তোমার 'লাইফ হেল করে' ছেড়ে দেব। সজল ঘোষ দাগি ক্রিমিনাল নিশ্চয়ই নন যে রীতিমতো দরজা ভেঙে রোমহর্ষক কায়দায় টিভিতে লাইভ দেখিয়ে গ্রেপ্তারির নাটক করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মীর প্রাপ্য মর্যাদা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সৌগত রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, সজল ঘোষ আসলে নাকি একজন গুন্ডা, তাই নাকি তিনি কোনোদিন ভোটে জিততে পারেননি ইত্যাদি। তাঁর কথার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, সজল ঘোষ মূলত ছাত্র রাজনীতি করেছেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতি সেভাবে করেননি। তাই ভোটে জেতা-না জেতাটা এক্ষেত্রে কিছু প্রমাণ করে না। এবং একথাও ভুললে চলবে না যে, ছাত্র রাজনীতিতে তাঁর সুবাদেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এসএফআইয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজত্বের সময়েও অন্তত কলকাতার বুকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। আসলে সৌগতবাবুর এই মনোভাব নতুন কিছু নয়, এটা তাঁর দলনেত্রীর মনোভাবেরই প্রতিফলন। তাঁর দলনেত্রীর পুরনো কর্মীদের ভুলে যাওয়া, তাঁরা বিরোধী দলে গেলে তাঁদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নেওয়া, এহেন আচরণের সাক্ষী এরাজ্যবাসী বহুবার হয়েছেন। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলো, ইনিই আবার দেশে গণতন্ত্র নেই বলে, তাঁর সাংসদদের দিয়ে সংসদের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটিয়ে জনগণের পয়সার অপচয় করান আর ঘোলা জলে মাছ ধরার লক্ষ্যে জোটের ধুয়ো তুলে বিজেপি বিরোধিতার জিগির উঠিয়ে দেশের রাজনীতিতে অস্থিরতা ডেকে আনেন।

> **ভোট পরবর্তী হিংসার সিবিআই তদন্তে আসল সত্যের উদঘাটন হবে, এটুকু আশা করাই যায়। কিন্তু যে প্রশ্নটা রয়ে যাচ্ছে, বিচার ব্যবস্থার হাত কতদূর প্রশস্ত? দলদাস প্রশাসনের আচরণ কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে প্রকৃত সুবিচার দিতে পারবে?**

ঠিক এই আঙ্গিক থেকেই বিচার্য রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসাজনিত পরিস্থিতি। দলনেত্রীর প্রতিহিংসা-পরায়ণ মনোভাবই দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সজল ঘোষের ঘটনাটা স্রেফ একটা উদাহরণ মাত্র। রাজ্যের জেলায় জেলায় নীরবে নিভৃতে এরকম কত ঘটনা যে ঘটছে! কিন্তু সেসব সংবাদমাধ্যমে আসে না বলে মানুষ জানতেও পারেন না।

পুলিশ-প্রশাসন সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এই মনোভাব বুঝেই নিজেদের দলদাসে পরিণত করেছে। এই যদি রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি হয়, তবে দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রেই অচিরে বড়োসড় সংকটের সৃষ্টি হবে। আশার কথা, দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এখনও আছে বলেই বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে। রাজনৈতিক হিংসা, বিরোধী দলের কর্মীদের ঘরবাড়ি জ্বালানো, রাজনৈতিক কারণে খুন ইত্যাদি বিষয়ে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক, রাজনৈতিক মুষল পর্বে শাসক দলেরও বহু কর্মী কিন্তু খুন হয়েছে। আর খুনের দায় চাপানো হচ্ছে প্রধান বিরোধী দলের ঘাড়ে। সিবিআই তদন্তে আসল সত্যের উদঘাটন হবে, এটুকু আশা করাই যায়। কিন্তু যে প্রশ্নটা রয়ে যাচ্ছে, বিচার ব্যবস্থার হাত কতদূর প্রশস্ত? দলদাস প্রশাসনের আচরণ কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে প্রকৃত সুবিচার দিতে পারবে? ◘

বিচারের বাণী কঠোর হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিষ্ফলা

সুজিত রায়

বিচারের বাণী কি সব সময়েই নীরবে নিভৃতে কাঁদে? বোধহয় না। কখনও কখনও দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের গুরুদায়িত্ব বহনের দায় নিয়ে নেন সুযোগ্য বিচারপতিরাই। তাঁদের কলমে ঝলসে ওঠে অন্যায়ের প্রতিবাদের চাবুক। আদালতের চার দেওয়ালের গণ্ডী ভেদ করে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যায় সেই অমোঘ বাণী— গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা কারও কেনা নয়। না বাদশার, না গোলামের। না কেন্দ্রের না রাজ্যের। না মোদীর, না মমতার। এক একটা বেলুনের মতো চুপসে যায় অন্যায়কারী, দুর্নীতিবাজ প্রশাসকের যত তর্জন, গর্জন, হুঙ্কার। বিচারব্যবস্থা এক রায়েই শিখিয়ে দেয়— অন্যায় করে তর্জনী তুলে গর্জন করলে দেশের বিচারব্যবস্থা জানে সেই তর্জনীকে কীভাবে গুঁড়িয়ে দিতে হয়।

সেটাই হলো ১৯ আগস্ট। চলতি বছরের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট পরবর্তী পর্যায়ে শাসক দলের প্রত্যক্ষ আক্রমণে বিধ্বস্ত গ্রামবাংলার হাজার হাজার অত্যাচারের ঘটনাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডের মতোই 'মিথ্যা সাজানো ঘটনা' বলেই পার পেতে চেয়েছিলেন। পেয়াদা সাংবাদিকদের প্রশ্নহীন নীরবতার মুখোমুখি হয়ে উগরে দিয়েছিলেন মিথ্যার রাশ— 'একটাও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। একজনও খুন হননি। একজনও ধর্ষিতা হয়নি। সব মিথ্যা, সাজানো নাটক।' জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা যখন ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পরিদর্শনে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর তর্জনী আবার সোজা হলো। প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন--- 'ওরা বিজেপির প্রতিনিধি। মানবাধিকার কর্মী নন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশে চলছেন ওরা।'

সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী যখন পিঠ বাঁচাতে পাগলের প্রলাপের মতো নাটকীয় ডায়ালগ দিয়ে গেছেন দিনের পর দিন বশংবদ সংবাদমাধ্যমগুলির সামনে, তখনও কিন্তু ২৯টি পরিবার বুকফাটা কান্নায় ভিজিয়ে চলেছেন মা-মাটি-মানুষের সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত ফুটিফাটা মাটির বুক। কারও ছেলে, কারও স্বামী, কারও দাদা, কারও ভাই শাসকদলের পোষা গুন্ডাদের হাতে শাস্তি পেয়ে ঠাঁই নিয়েছে চুল্লিতে কিংবা কবরে। অপরাধ একটাই— ওঁরা বিজেপির সমর্থক।

তখনও জেলায় জেলায় থানায় থানায় প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ ভিড় করেছেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে, পুলিশি সহায়তা পেতে। পুলিশ সাহস পায়নি। কারণ ওপরতলার নির্দেশ— এফআইআর নেওয়া যাবে না। ওগুলো সব সাজানো ঘটনা। তখনও বারোজন তরুণী কিংবা গৃহবধূ ধর্ষিতার শিকার হয়ে কিংবা শাসকদলের দাদাগিরিতে নারীত্বের সম্মান বিকিয়ে ঘরের কোণে মুখ

এ রাজ্যের প্রশাসকের কাছে বিচারের রায় শেষ কথা নয়। তাই সরকারকে আদালত চেতাবনি দেওয়ার পরও এ রাজ্যের অত্যাচারের খড়্গ অপসৃয়মাণ হয় না। অত্যাচারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ পায় না। ধর্ষণের সংখ্যা কমে না। বছরের পর বছর পুরসভাগুলির নির্বাচন হয় না। 'উন্নয়ন' জেগে থাকে অভিধানের পাতায়, সরকারি বিজ্ঞাপনে, আর মুখ্যমন্ত্রীর হযবরল ভাষণে।

লুকিয়েছেন। না, প্রতিবাদ করার সাহস পাননি কারণ তাহলেই দ্বিতীয়বার ধর্ষিতা হতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর 'সাজানো নাটক'-এর সাজানো বাগানে। তখনও ৯৪০টি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছেন শাসকদলের হীনমন্য চটিচাটা দাদাদের হাতে সম্পত্তি লুটের ঘটনায়। না, পুলিশ সোচ্চার হয়নি। দাদাদের পাশেই দাঁড়িয়েছে ওপরতলা অর্থাৎ নবান্নের নির্দেশে। সে নির্দেশও যিনি দিয়েছেন, তিনি তখন নবান্নের ১৩ তলার সবুজ বাগানে পায়চারিরত। বড়ো মানুষের সখ!

তবু এরই মধ্যে বিরোধী দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গোটা রাজ্যে মাত্র ১৯৩৪টি অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করা সম্ভব হয়েছিল। যত সংখ্যক অপরাধীর নাম ওইসব অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মাত্র ৩ শতাংশ হাজতে ঢুকেছে, সংখ্যায় যা মাত্র ৯৩০৪। বাকিরা নিরাপদ আঁচলের ঘেরাটোপে নিশ্চিন্তে দাদাগিরি করে চলেছে ঘেসো রাজনীতির ময়দানে।

ওই অন্যায়, এই অত্যাচার, এই রাজনৈতিক প্রশ্রয় আর মিথ্যাচারের পিঠে চাবুক কষিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ বিচারপতি বিন্দুমাত্র দ্বিমত পোষণ না করে যে, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলি সব সময়েই সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী। পুলিশের ভূমিকাও সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রের হত্যাকারীর মতোই।

এই পাঁচ মাননীয় বিচারক হলেন : কার্যকরী মুখ্য বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, আইপি মুখার্জি, হরিশ ট্যান্ডন, সৌমেন সেন এবং সুব্রত তালুকদার। যে বিধান এই পাঁচ বিচারপতি সম্মিলিতভাবে দিয়েছেন তা হলো :

১। ভোট-পরবর্তী সময়ে খুন, ধর্ষণ ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই। সিআইডি বা রাজ্য পুলিশ নয়।

২। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম একই সঙ্গে অন্যান্য হিংসার ঘটনার তদন্ত চালাবে। সিট-এর তিন সদস্য হবেন তিন আইপিএস

অফিসার সুমনবালা সাহা, সৌমেন মিত্র ও রণবীর কুমার।

৩। সমস্ত তদন্তই চলবে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। সিবিআই ও সিট রিপোর্ট জমা দেবে ছ' সপ্তাহের মধ্যে।

৪। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য।

৫। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য সরকারের অভিযোগ মতো, কখনই পক্ষপাতিত্ব করেনি।

বিচারপতিদের রায় অনুযায়ী, সিট-এ নিযুক্ত তিন আইপিএস অফিসার আপাতত তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। মানবাধিকার কমিশন গঠিত কমিটির রিপোর্ট সংক্রান্ত বাকি বিষয়গুলির শুনানি হবে ডিভিশন বেঞ্চে। ক্ষতিপূরণের সমস্ত অর্থ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো : বেলেঘাটায় ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বলে অভিযোগ অনুযায়ী অভিজিৎ সরকারের দেহের দ্বিতীয় অটোপসি রিপোর্ট-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য সিবিআই-কে হস্তান্তর করতে হবে। বাকি অভিযোগ হস্তান্তর করতে হবে সিটকে। হাইকোর্টের অতিরিক্ত নির্দেশ— সিট-এর কোনও কাজ রাজ্য সরকারের অপছন্দ হলেও রাজ্য ওই তিন আইপিএস অফিসার ডিজি টেলিকম সুমনবালা সাহা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র এবং এডিজি (প্রশাসন) রণবীর কুমার-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। রাজ্যের সব দপ্তরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে যাতে সিট দ্রুত তার তদন্ত শেষ করতে পারে।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করে তোলা। তার জন্য যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করতে কসুর করেনি শাসকদল ও প্রশাসন। সরকারি কর্মচারী থেকে আমলা, স্থানীয় স্তরের দুষ্কৃতী থেকে পুলিশ— সকলকেই দলদাস বানিয়ে রাজ্য রাজনীতিকে বিরোধীমুক্ত করে তোলে তৃণমূল। কংগ্রেসের পাশাপাশি বাম দলগুলিও ক্রমশ রাজনৈতিক পুঁজি হারিয়ে শূন্যতায় এসে পৌঁছায়। একমাত্র চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় বিজেপি। প্রথমে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং এরপর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই মাথাব্যথা হয়ে ওঠে তৃণমূলের। যে রাজ্যে বিজেপি নেতা-কর্মীদের খুঁজে পাওয়া ভার ছিল, সেখানে রাজনৈতিক ভরশক্তির ভারসাম্যে নতুন ছন্দ আনে বিজেপি। মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল— এবার বদলাবে সরকার। কিন্তু না, সেটা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান কেড়ে নিয়ে তৃণমূল সরকার রাজ্যের মানুষকে ভিখারিতে পরিণত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল, তাতেই মত্ত হয়ে ওঠেন রাজ্যের একটি বড়ো অংশের জনগণ, মূলত সংখ্যালঘুরা। বিনা পয়সার রেশন, বিনা পয়সার সাইকেল থেকে শুরু করে হাতে হাতে হাজার হাজার টাকা নগদ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ঘুষের রাজনীতির খেলায় জিতে যায় তৃণমূল। কিন্তু বিজেপিও ৭৭টি আসনে জিতে সকলকে চমকে দিয়েছে।

চমকে যায় তৃমমূল। এতো ভয়ঙ্কর! এবার ৭৭। পরের নির্বাচনে যদি তা ২৭৭ হয়ে যায়। অতএব নামিয়ে আনো হিংসার কালো মেঘ। ফলাফল চূড়ান্ত হওয়ার আগে থেকেই গ্রামেগঞ্জে শহরতলীতে শুরু হয়ে যায় একতরফা আক্রমণ। এ আক্রমণের মোকাবিলার জন্য বিজেপি প্রস্তুত ছিল না। কারণ কেউ ভাবতেই পারেনি, এতখানি নৃশংস হতে পারে কোনো মহিলা নেত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার। কেউ ভাবতে পারেনি, একজন মহিলা নেত্রীর দলীয় দুষ্কৃতীরা ঘরের কিশোরীদের ধর্ষণ করে যাবে শুধুমাত্র একটি অপরাধে, তার বাবা বিজেপির সমর্থক। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়। হাজার হাজার পরিবারের পরনের বসন ছাড়া বাকি সব লুট করে নিয়ে যায় দিদির ভাইয়েরা। গরিবের কুঁড়েঘরে আগুন লাগে। পলাতক বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয় দুটি শর্তে— (ক) প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবোস করে ক্ষমা চাইতে হবে, (খ) মুচলেকা দিতে হবে--- আর কখনও বিজেপিকে সমর্থন করবেন না। তৃণমূলের সমর্থক হতেই হবে। যাঁরা মেনেছেন, তাঁরা ঘরে ফিরেছেন। যাঁরা মানেননি, তাঁদের খুন করা হয়েছে। এখনও অনেকে ঘরছাড়া।

সমস্ত সত্য ঘটনাগুলোর ভিডিয়ো নির্ভর তথ্য যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ঝড়ের গতিতে, মুখ্যমন্ত্রী তখনও বলে গেছেন— সব মিথ্যা, বানানো। নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করে আক্রমণ করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় ও মাননীয়া সদস্য সদস্যাদের। প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রাজ্যে সত্যাবাদী তিনি একাই।

রাজ সরকার তথা শাসকদলের এই হিটলারি মনোভাবের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এ রায় শুধুমাত্র কয়েকটি হিংসার ঘটনার বিরুদ্ধে নয়। এ রায় মূলত একটি অবক্ষয়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রায়। মানবাধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনীতির অধিকার রক্ষার স্বার্থে রায়।

এ প্রসঙ্গে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি ট্যান্ডন বলেছেন--- সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালত কখনও নীরব থাকতে পারে না, মানুষের অধিকার রক্ষায় আদালতকে পদক্ষেপ করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে মানুষের শেষ আশ্রয় তাই আদালত। আদালতের রায়। আদালতের রায়ই মানবাধিকারের স্বীকৃতি— মানুষের জয় সেখানেই।

কিন্তু এটাই কি শেষ কথা? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো অবক্ষয়ী রাজনীতির এক রাজ্যে? এ রাজ্যের প্রশাসনের কাছে কি সত্যিই মূল্য আছে বিচারের রায়ের? মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা— এ রাজ্যের প্রশাসকের কাছে বিচারের রায় শেষ কথা নয়। তাই সরকারকে আদালত চেতাবনি দেওয়ার পরও এ রাজ্যের অত্যাচারের খড়্গ অপসৃয়মাণ হয় না। অত্যাচারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ পায় না। ধর্ষণের সংখ্যা কমে না। বছরের পর বছর পুরসভাগুলির নির্বাচন হয় না। 'উন্নয়ন' জেগে থাকে অভিধানের পাতায়, সরকারি বিজ্ঞাপনে, আর মুখ্যমন্ত্রীর হযবরল ভাষণে। কলকাতা জলে ডুবে থাকে সপ্তাহভর। রাজ্য ভাসে বন্যায়। বানের জল আর মানুষের চোখের জল এক হয়ে ঝরে পড়ে যখন, তখন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানো মহিলাদের হাতেও তুলে দেয় বছরে ৬০০০ টাকা। উন্নয়ন। ভিক্ষাবৃত্তির উন্নয়নে জেগে থাকে রাজ্য। রাজ্যবাসী। আদালত হাতুড়ি পিটেই যায়... পিটেই যায়...। □

ভোট-পরবর্তী হিংসার তদন্তে সিবিআই

জাহ্নবী রায়

রাজ্যের শাসক দল নিজেদের ধোয়া তুলসিপাতা প্রমাণে ব্যস্ত। অন্যদিকে ত্রিপুরায় গিয়ে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিতে চাইছে। এরই মাঝে রাজ্যে তাঁদের মাথায় অনেকটা বজ্রাঘাতের মতো নেমে এল কলকাতা হাইকোর্টের রায়। কলকাতা হাইকোর্ট এই ধোয়া তুলসি পাতা রাজ্যের শাসক দলের ভিজে বেড়াল সেজে কাকে নগ্ন করে দিল অলক্ষ্যে। তাঁরা বললেন, ভোট পরবর্তী সময়ে যা যা হয়েছে, খুন, ধর্ষণ, হিংসা সব কিছুর তদন্ত হবে। সে তদন্ত হবে একেবারে দুদিক থেকে। খুন ও ধর্ষণের তদন্ত করবে সিবিআই। হিংসা ও অশান্তির বাকি ঘটনাগুলির তদন্তের নজরদারিতে থাকবে সিট। কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুই তদন্তই চলবে একেবারে কলকাতা উচ্চ আদালতের নজরদারিতে। এই রায়ের কপি ইতিমধ্যেই চলে গেছে রাজ্য সরকারের কাছে। একটি সূত্র বলছে তাঁরা হয়তো সুপ্রিম কোর্টে যাবে। এর কারণ সিবিআই তদন্ত ভার নিলে, তখন এসব ঘটনার ক্ষেত্রে রাজ্যের অনেক অধিকারেই নাক গলাবে সিবিআই। অন্য একটি কারণও রাজ্যের শাসক দলের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা হলো রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গালভরা কথা বলে শাসক দল। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যখন নানা অভিযোগ, বিশেষ করে ভোট পরবর্তী সময়ে যে তাণ্ডব চলছে বিজেপি সমর্থকদের ওপর, সেটা নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়, তখন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে শাসক দল বলে, 'কোনো ঘটনাই ঘটেনি। সব বানানো কথা।' প্রসঙ্গত, বিরোধীদের এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল আক্রান্ত, নির্যাতিত এবং মৃতের পরিবারের সঙ্গে কোথাও বলে, তারপর তাঁদের একটি রিপোর্ট জমা দেয়। একটি সূত্র মারফৎ জানা গেছে, সেখানে তাঁরা একেবারে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বিরোধীদের ওপর অত্যাচারের। এই অত্যাচারের কথা শুনে রাজ্যের রাজ্যপালও বারে বারে তাঁর উদ্বিগ্ন হবার বিষয়টা প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, ফিরে আসা যাক আগের কথায়, কলকাতা উচ্চ আদালতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, বিচারপতি সুব্রত তালুকদার, বিচারপতি সৌমেন সেনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন তাঁরা আরও জানান সিটের কাজ তদারকির জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করা হবে। ছয় সপ্তাহের তদন্তের গতি প্রকৃতি জানিয়ে একটি রিপোর্ট সিবিআইকে পেশ করতে হবে কলকাতা উচ্চ আদালতের কাছে। পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৪ অক্টোবর।

এদিকে উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্তদের নিয়ম মেনে ক্ষতি পূরণ দেবার। এই ক্ষতি পূরণ দেবে রাজ্য সরকার। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, এই মামলায় আবেদনকারীদের অভিযোগ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের রাজ্যে আসা সমেত একগুচ্ছ বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আপত্তির বিষয়টাও এদিন খারিজ হয়ে যায়। একটি সূত্র জানাচ্ছে যে আদালতের কাছে মোট ১৯৭৯টি অভিযোগ জমা পড়েছিল।

১৯ আগস্ট, ২০২১-এর এই রায়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিরোধী দল ও আক্রান্তদের পরিবার স্বাগত জানিয়েছে। তাঁদের মতে এবার প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কলকাতা উচ্চ আদালতের রায় : ভোটের পর ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত করবে সিবিআই। বাকি সব ঘটনার তদন্তের ভার ও নজরদারিতে থাকবে সিট। এই সিটের নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্য পুলিশের (টেলিকম) ডিজি সুমন বালা সাহু, বাকিরা হচ্ছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, সৌমেন মিত্র, এডিজি রণবীর কুমার। পুরো সিটের নজরদারিতে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসপ্রাপ্ত বিচারপতি।

যদি দেখা যায় কোনো মামলার সঙ্গে ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে সেই সব বিষয় যাবে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ-এর কাছে। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিবিআই এবং সিট দু'তরফকেই। একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জমা দিয়েছিল তিন হাজার পাতার রিপোর্ট, আর রাজ্য সরকারের তরফে জমা পড়েছিল দশ হাজার পাতার রিপোর্ট। রায়ের কপি হয় ১২৪ পাতার।

তালিবান এই দেশে কতটা ক্ষতিকর

আফগানিস্তানে অমানবিক তালিবান রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চীন পাকিস্তান তুরস্ক রাশিয়া-সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়নি। অনেকদিন থেকেই ভারতের বিরোধিতা করে আসছিল এই দেশগুলি। ফলে ভারত কিন্তু এই দেশগুলি সম্পর্কে অবহিত।

সুকল্প চৌধুরী

আফগানিস্তানে তালিবানের সন্ত্রাসী শাসন কায়েমের সমর্থনে খাস কলকাতা শহরের খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ এবং লাগোয়া এলাকায় অটোমেটিক রাইফেল-সহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দেশ বিরোধী ও হিন্দু কোতলের স্লোগান তুলে বর্বরের উল্লাসে মহরম পালন করল এক শ্রেণীর মুসলমান। মধ্যযুগীয় অসভ্যতা মেনে চলা ও মানবতা বিরোধী দুধেল গোরুদের কাছে এবারের মহরম পৈশাচিক উল্লাসের উপহার এনে দিয়েছে তালিবান। সাধারণ ভাবে শিয়া মুসলমানদের কাছে মহরম নিদারুণ শোকের হলেও অনেক সুন্নির কাছেও দিনটি মর্যাদার। এই রাজ্য তো বটেই ভারতের মুসলমানরা প্রায় সবাই সুন্নি সম্প্রদায়ের। অপরদিকে তালিবানরাও সবাই একই গোষ্ঠীর। ফলে রাজ্যের মুসলমানরা জেহাদির উল্লাসে আফগান ভাই বেরাদরদের সমর্থনে হিন্দুদের রক্ত ঝরানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ভোট পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে খুন, ধর্ষণ, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, সম্পত্তি লুঠের মতো ভয়াবহ ঘটনার পরও যে-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'সবটাই মিথ্যে' বলে জোর করে সকলের মুখ বন্ধ করে রাখে, সেই রাজ্যে মহরমে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের খুনের হুমকি প্রশাসনের কানে স্বাভাবিক ভাবেই পৌঁছাবে না।

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও নাটোর সেনা প্রত্যাহারের ছয়দিনের ভেতর তালিবানদের কাবুল দখল এবং তার পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির কথা সবাই জানেন। কিন্তু কাবুলের এই ক্ষমতা বদলের পর ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কলকাতায় মহরমের দিন মুসলমানদের সন্ত্রাসী মনোভাবের কার্যকলাপ উল্লেখ করা জরুরি ছিল। কারণ এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। সবাই জানেন, বিশ্বে যত সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে সবটাই করে সুন্নি মুসলমানরা। তারা মনে করে এই মানবজন্ম আনন্দের জন্য নয়। কষ্টের জন্য। মানবজাতির হুরিপরিদের সঙ্গে নিত্য সুখভোগ হবে মৃত্যুর পরে। তাই হাদিসের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আর অপরকেও সেই নিয়ম মানতে বাধ্য করতে হবে। আর মহিলারা হলো পুরুষের ভোগ্যপণ্য মাত্র। মহিলাদের বেত্রাঘাত করে শাসনে রাখতে হবে। অতি প্রাচীন এবং বর্বর ঘৃণ্য প্রথাকে সুন্নিরা মেনে চলে। তাদের কাছে হত্যা কোনও পাপ নয়। তালিবানরাও মনে করে তাদের মতের বিরোধীদের খুন করা পবিত্র কাজ।

পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের সেনা, আধা সেনা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং সবার উপরে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার আছে। ফলে সামরিক আক্রমণ করতে কেউ সাহসী হবে না। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। এই দেশে যারা বসবাস করেন সবাই ভারতীয় কিন্তু প্রশ্ন হলো সবাই তো আর দেশপ্রেমিক নয়। মধ্যপ্রাচ্য প্রেমিক। বিশেষ করে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল আছে এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা আছেন যারা প্রকাশ্যেই ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু মুসলমান রাজনৈতিক নেতা আছেন যারা হয়তো সাংসদ বা বিধায়ক এমনকী কোনো রাজ্যের মন্ত্রীও, তাঁদের ভেতর অনেকেই প্রকাশ্যে দেশ বিরোধিতা করেন। যেমন মেহেবুবা মুফতি, ওয়েসি, ফারুক আব্দুল্লা বা এই রাজ্যের ফিরহাদ হাকিম। তাঁদের সবাই চেনেন। কিন্তু সোনিয়া গান্ধী, শরদ পাওয়ার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই আছেন যারা তাদের কার্যকলাপ দিয়েই দেশ বিরোধিতা করেন। ক্ষমতা দখলের স্বার্থে এই আপাত মুখোশধারীরা প্রকাশ্যে মুসলমান তোষণ করেন। আর এই সুযোগ নিয়ে মুসলমান সন্ত্রাসবাদী জেহাদিরা প্রথম থেকেই ঘাঁটি গেড়েছে দেশে। সবাই জানেন, দাউদ ইব্রাহিমকে মহারাষ্ট্রের কোনো বিশিষ্ট হিন্দু নেতা কেন দেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্য করেছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই নেতাদেরও চেষ্টা করলে চেনা যায় কিন্তু কমিউনিস্ট এবং তথাকথিত সেকুলারদের নিয়ে সমস্যা অনেক। তারা আবার মুসলমানদের ভীষণ সরল আর ভালো বলে মনে করে। পাকিস্তানে হিন্দু হত্যা, মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া তাদের মনে দাগ ফেলে না। মুসলমানদের সমালোচনা শুনলেই এদের বুকে জ্বালা ধরে। আমেরিকায় হামলার পরে এদেশের সেকুলাররা 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে চিহ্নিত করেছিল।

তালিবানরা ক্ষমতা দখলের পর স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। তালিবানরা বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে। আখরোট, কাঠবাদাম, পেস্তা-সহ বিভিন্ন শুকনো ফল আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসবে না। চীন ঘোষণা করেছে এসব তারা আরও বেশি দামে তালিবান সরকারের কাছ থেকে কিনে নেবে। বেজিং স্বল্পমূল্যে ওষুধ আর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসও সরবরাহ করবে। রশিয়াও তাই। আর পাকিস্তান তো বলেই দিয়েছে কাবুল স্বাধীন হলো। আফগানিস্তানে ইতিমধ্যেই চীন ও পাকিস্তান সেনা, অস্ত্র-সহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাঠাতে শুরু করেছে। যা কিনা ভারতের কাছে উদ্বেগের। ঘুরপথে এই অস্ত্র সন্ত্রাসীরা ভারতে এনে হিংসা ছড়াবে। ভারতের আরেক সমস্যা হলো রাশিয়াকে নিয়ে। তারাও কাবুলের তালিবান সরকারকে সমর্থন করেছে। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক কারণে আমেরিকাকে চাপে রাখতে ভারতের মিত্র দেশ ছিল। সোভিয়েত পতনের পর রাশিয়ার এক নায়ক শাসক পুতিন 'নিজের স্বার্থে পাশের ঘরের শত্রুকে মিত্র করে নেওয়ার' নীতিতে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। সেই সুবাদে চীনের পাশাপাশি পাকিস্তানও এখন রাশিয়ার বন্ধু। কোনও সন্দেহ নেই রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অক্ষরেখায় ভারতের বন্ধুদেশ এখন কেউ নেই। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ, চন্দ্রশেখর, ইন্দ্রকুমার গুজরাল এবং রাজীব গান্ধীর সময়

বিদেশনীতির কোনও দিশা ছিল না। পরবর্তী সময়ে পিভি নরসিমা রাও-এর বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে পররাষ্ট্র নীতির কিছুটা স্থিরতা আসে। এই দিশা না থাকার কারণে প্রতিবেশী অনেক বন্ধুই দূরে সরে গিয়েছে। তবে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর সঠিক ও শক্ত বিদেশনীতি নিয়েছে ভারত। আমেরিকার পূর্ববর্তী দুই প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে গিয়েছেন। কিন্তু জো বাইডেনের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা দ্রুত সরানোর জন্য ভারতের ভেতরে ও বাইরের মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয় হতে চাইবে। সকলেই বুঝতে পারছেন এবারে কাশ্মীরে হিংসা সন্ত্রাস হত্যা আরও বাড়াবে পাকিস্তান। এদেশের সন্ত্রাসবাদীরা অবশ্যই তৎপর হতে শুরু করেছে। মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তা করতে প্রথম থেকেই প্রস্তুত দিনার-ডলার পুষ্ট কিছু রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তি। পাশাপাশি আগেই এদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কিছু মুসলমান ব্যবসায়ী, ডন-মাফিয়া।

এদেশে যত সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে তাতে অবশ্যই যুক্ত করাচী, দুবাই। আবার সক্রিয় ভাবে যুক্ত এদেশে বসবাসকারী মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তাদের প্রত্যক্ষ হাত ছাড়া মুম্বই হামলা হতে পারে না। দৃষ্টি ঘোরাতে কাসবদের পাকিস্তান থেকে ভাড়া করা হয়েছিল। আফগানিস্তানের ঘটনাক্রমে আর্থিক ভাবে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে ভারতের। কারণ সেখানে ভারতীয় বিনিয়োগ প্রায় ২৫ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তবে ভারতের আশার কথা, ইরান কিন্তু আফগানিস্তানের পাশে নেই। শিয়া অধ্যুষিত আয়াতুল্লা খোমেনির দেশেও সুন্নি জঙ্গি তালিবানরা হামলা চালিয়েছিল। তালিবান সমর্থক হলেও বাণিজ্যিক কারণে সৌদি আরব এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না। তবে মৌলবাদী তুরস্ক কাতার কুয়েত সুদান জর্ডন ভারতের পাশে নেই। ভারত নিয়ে ইরাক তাদের মনোভাব গোপন রেখেছে। ভারত কিছুটা সমর্থন পাবে ব্রিটেন, জার্মানি, ইজরায়েল, ফ্রান্স থেকে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা প্রথম থেকেই ভারত বিরোধী। তারা তালিবান নিয়ে উৎসাহিত। তবে সেদেশের সরকার অন্তত প্রকাশ্যে ভারতের পাশে আছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার বাংলাদেশের অনেক মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোরতর সমর্থক। এই মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম সহায়ক ও সাহায্যকারী আহমদ হাসান ইমরানকে রাজ্যসভার সদস্য করেছিলেন মমতা। আফগানিস্তানে অমানবিক তালিবান রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চীন পাকিস্তান তুরস্ক রাশিয়া-সহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়নি। অনেকদিন থেকেই ভারতের বিরোধিতা করে আসছিল এই দেশগুলি। ফলে ভারত কিন্তু এই দেশগুলি সম্পর্কে অবহিত। তবে অবশ্যই এখন আবার নতুন করে এই দেশগুলিকে নিয়ে ভাবা দরকার।

রাজনৈতিক সাংবাদিকরা মনে করেন, বাইরের শত্রুর থেকে ঘরের শত্রু বড়ো। ফলে প্রত্যক্ষ তালিবানি মদত থেকে দেশকে রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকাশ্যেই আরও কঠোর হওয়া দরকার। এই রাজ্য এবং মহারাষ্ট্রের দিকে তাকালে কঠোরতার প্রয়োজন কেন বোঝা যায়। আফগানিস্তানের পট পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব রাজনীতির বিষয়টি অবশ্যই মাথায় থাকবে। কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুসলমান মৌলবাদী আগ্রাসন সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া, মুসলমান তোষণ, নিয়মের বাইরে গিয়ে সরকারি সাহায্য প্রদান সবই দরকার হলে কঠোর আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করা প্রয়োজন। দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন মানবতার মহা গুণ। যা হিন্দুদের রোজকার জীবন যাপনে আছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে জানি রাজা পৃথীরাজের ক্ষমা প্রদর্শনের পর দেশটাই পালটে গিয়েছে। তাই এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার মানবতার এই মহৎ গুণকে নয় একটু আড়াল করা গেল নিজেদের স্বার্থে। ■

করোনা বিধি শিকেয় তুলে দুয়ারে সরকার

চন্দ্রভানু ঘোষাল

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছেই আইন। তাঁর যা ইচ্ছে হবে, তিনি যা বলবেন— পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি বললেন, করোনা মহামারীর জন্য পশ্চিমবঙ্গে লকডাউন নয়, কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। আগস্ট মাসেও এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। কেমন সেই বিধিনিষেধ তার উদাহরণস্বরূপ হাওড়া জেলার কথা বলা যেতে পারে। হাওড়া শহরের প্রত্যেকটি থানায় এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাগুলিতে সপ্তাহের একেক দিনে পর্যায়ক্রমিক লকডাউনের (কিংবা বিধিনিষেধের) সিদ্ধান্ত এখনও বহাল। যে এলাকায় যেদিন লকডাউন তার আগের দিন পুরসভার তরফ থেকে এলাকাবাসীকে সচেতন করার প্রয়াসও চলছে। অর্থাৎ হাওড়া শহর এখনও করোনামুক্ত নয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা এখনও কনটেন্টমেন্ট জোন। অথচ এরই মধ্যে উপস্থিত হয়েছে দুয়ারে সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে নথিভুক্তির কাজ চলছে পুরোদমে। মহিলারা সকাল থেকে দলে দলে এসে নথিভুক্তিকরণের শিবিরে লাইন দিচ্ছেন। তাদের বেশিরভাগের মুখেই মাস্ক নেই। প্রশ্ন হলো, প্রশাসনের ঘোষিত কনটেন্টমেন্ট জোনে করোনা বিধি অগ্রাহ্য করার ফলে সংক্রমণ যদি বাড়ে তাহলে তার জন্য কে দায়ী হবে? সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণের হার আবার বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের শিবিরে এই বিপুল জনসমাগম কতটা যুক্তিসংগত তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলটি অবশ্য সুযুক্তি এবং কুযুক্তির তফাতটি বোঝে না। তারা শুধু ভোটের কথা ভাবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে নাম নথিভুক্তিকরণের এই উৎসাহ দেখে তারা যেমন আসন্ন উপনির্বাচনগুলিতে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্তবোধ করছেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরাও কি প্রশাসনের কর্তাদের মতো শুধু ক্ষমতাসীন দলকে ভোটে জেতানোর কথা ভাবছেন? তাদের তো বোঝা উচিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে সরকারের দেওয়া মাসিক পাঁচশো টাকায় করোনার চিকিৎসা হবে না। উপরন্তু, জীবনহানিও ঘটতে পারে। অবশ্য কেউ যদি মনে করেন, লাইনে দাঁড়িয়ে করোনায় মৃত্যু হলে সরকার নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দেবে, তাই মাস্ক না পরে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাই যায়— তাহলে কিছু বলার নেই! জীবনকে যারা ক্ষতি বলে মনে করেন এবং ক্ষতিপূরণ পেলেই মৃত্যুকে মেনে নেন, তাঁরা সত্যিই নমস্য। এদের বাদ দিয়ে বৃহত্তর যে সমাজ তাদের ভেবে দেখতে হবে অবশ্যই।

স্বস্তিকা দপ্তরে জাতীয়পাতাকা উত্তোলন

গত ১৫ আগস্ট সকাল ৭টায় স্বস্তিকা অফিসের সামনে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সারদা প্রসাদ পাল তথা স্বস্তিকার প্রকাশক। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ শ্রী অদ্বৈতচরণ দত্ত। দেশভক্তি, বন্দেমাতরম্ গীত, পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি গর্ব অনুভব করা সকল ভারতীয়র কর্তব্য কথা তুলে ধরেন। স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক বিজয় আঢ্য বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক বীর চুড়কা মুর্মুর স্মারক গ্রন্থ উন্মোচন করেন এবং চুড়কা মুর্মুর বীরগাথা তুলে ধরেন।

মমতাকে রোমান চার্চের আমন্ত্রণ, কৌতূহল সর্বস্তরে

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোমে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অন্যান্য আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন পোপ ফ্র্যান্সিস, মিশরের আল-আজহারের প্রধান ইমাম আহমেদ আল তায়িব, ইক্যুমেনিক্যাল প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম বার্থোলোমিউ এবং জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। রোমস্থিত এই সম্প্রদায় দুদিনব্যাপী বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে সারা পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। স্যান্টইজিডিও সম্প্রদায়ের সভাপতি অধ্যাপক মার্কো ইম্প্যাজলিয়াৎসো এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চিঠির তারিখ ২২ জুলাই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভ্রাতৃসমশান্তির জনগণের জন্য বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরের ৬ ও ৭ তারিখ।

এই আপাত নিরীহ বিষয়ে সাধারণ অপাপবিদ্ধ জনমনে তেমন একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু ঘরপোড়া গোরু আমরা সন্দিগ্ধ না হয়ে পারি না। জিজ্ঞাসু ও বিশ্লেষণী মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত ও বাস্তব নীতি কী? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বা ডাকা হলো কেন? সারা পৃথিবীতে বহু দেশ আছে, প্রায় ২১৩টি। এইসব দেশের মধ্যে অধিকাংশ দেশেই অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ আছে। সেই সব অঙ্গরাজ্যে প্রশাসনিক প্রধানও আছেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে তা করা হয়। ভারতবর্ষে এইরকম প্রশাসনিক অঞ্চল আছে ৩৬টা (২৮টা রাজ্য ও ৮টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল)। তাদের কাউকে না ডেকে শুধু তাকেই বাছা হলো কেন? ওই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যপূরণে মমতার বিশেষ

প্রাসঙ্গিকতা কী? এর উত্তর দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক আমন্ত্রণ পত্রে কী লেখা আছে।

অধ্যাপক মার্কো ইম্প্যাজলিয়াৎসো পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া এবং 'দশ বছর ধরে সামাজিক ন্যায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, দেশের উন্নতি এবং তদর্থে শান্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের জন্য' শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি বলতে চাই যে আমি দুর্বলতম ও সর্বাপেক্ষা অবহেলিত মানুষদের জন্য আপনার অঙ্গীকার ও মহৎ কাজ অনুভব করেছি। এটা আমার সংবেদনশীলতা এবং বিশ্ব ও রোমে স্যান্টইজিডিও সম্প্রদায়ের কাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৯৮০-র মাঝামাঝি থেকে এই সম্প্রদায়, 'শান্তি ও ধর্মীয় দপ্তরের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রিস্টান চার্চ ও বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে আলোচনা আয়োজন করে আসছে। ১৯৮৬ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল ঐতিহাসিক 'অ্যাসিসি প্রার্থনা দিবস'-এর ডাক দিয়েছিলেন তার উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৭ থেকে আন্তর্জাতিক শান্তিবৈঠকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে। এই বৈঠকগুলো ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৫০০ জন উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেখানে সাধারণ অধিবেশন ও নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বৈঠকে তাদের অবদানের কথা জানাতে বলা হয়েছে। ওই কমিউনিটির ওয়েবসাইটে আছে গত বছর ২০ অক্টোবর রোমে এই আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠক হয়েছিল। (সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে, হিন্দুস্তান টাইমস ও টিভি ৯ বাংলা)

স্যান্টইজিডিও সম্প্রদায় কী?

১৯৬৮ সালে অ্যান্ড্রিয়া রিকার্ডির নেতৃত্বে লে ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশন সমাজসেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়েন। ১৯৩৭ সালে এরা রোমের স্যান্টইজিডিও চার্চে প্রধান কার্যালয় খোলেন। ১৯৮৬ সালে রোমান কুরিয়া এদের খ্রিস্টান মতে 'বিশ্বাসী'দের জন্য একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ বলে স্বীকৃতি দেন।

এখানে প্রতি সন্ধ্যায় সব সদস্য প্রার্থনার জন্য সমাবিষ্ট হন। সেটা খোলা জায়াগায়

প্রধান চার্চে হয়। প্রত্যেক দিন বাইবেলের একটা অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করা হয়, এটা করা হয় আরও বেশি করে যীশুকে মানার অনুপ্রেরণা হিসেবে। দরিদ্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন ও সব জাতির মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা এদের ঘোষিত লক্ষ্য। এদের কাজ করার অনুঘটক হলো আপোশ ও সংঘর্ষ! স্যান্টইজিডিও চার্চের পোপ রোম ফ্র্যান্সিস ২০১৪ সালে ১৪ জুন স্যান্টইজিডিও সম্প্রদায়ের জন্য তিনটে ইংরেজি 'পি' নির্দিষ্ট করেছেন— প্রেয়ার, পুওর ও পিস। ফ্র্যান্সিসের স্বপ্ন চার্চ যেন ক্যাথোলিকদের জন্য একটা ফিল্ড হসপিটালের কাজ করে। শান্তির জন্য স্থাপিত স্কুলে খ্রিস্টান বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানবতা, শান্তি ও সহাবস্থান শেখানো হয়। ২০১৯ সালের মধ্যে এরা ১০০০০ শিশু ও অল্পবয়সী তরুণদের সদস্য করেছে।

১৯৮৬ সালে অ্যাসিসিতে প্রথম সম্মেলনের পরে যেসব স্থানে সম্মেলন হয়েছে— সেগুলো হলো ফ্রান্সের লিওন (২০০৫), যুক্তরাষ্ট্র (২০০৬), বার্সিলনা (২০১০), মিউনিখ (২০১১), সারাজেভো (২০১২), রোম (২০১৩), আন্টোয়ার্প (২০১৪), টিরানা (২০১৫), অ্যাসিসি (২০১৬), জার্মানির মুন্টার ও অস্রাবাক (২০১৭)। শেষেরটায় অ্যাঞ্জেলা মার্কেল উপস্থিত ছিলেন (ইনি যে পার্টির সদস্য তার নাম খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)।

এই সব বার্ষিক বৈঠকে ইক্যুমেনিজমের একটা জোরালো উপাদান আছে। ইক্যুমেজিমের অর্থ হলো বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বজনীনতা স্থাপন করা। খ্রিস্টান বিশ্বাসের সর্বজনীনতা ও চার্চগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। আদিম চার্চ যে ঈশ্বরের পুত্রের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছিলেন তার উপর জোর দেওয়া হয়। আধুনিক বহুত্ববাদী দুনিয়ায় যে হতাশা, সমস্যা ও বিড়ম্বনা দেখা যাচ্ছে তার মোকাবিলা করা এর কাজ। এইসব শান্তি বৈঠকে আলোচনা করা হয় কীভাবে খ্রিস্টান ধর্মকে আরও জোরালো করা যায়, কীভাবে মুসলমান, ক্যাথোলিক, ইহুদি সব গোষ্ঠীর খ্রিস্টান (প্রায় চার হাজারের উপর খ্রিস্টান গোষ্ঠী আছে), মানবতাবাদী ও অবিশ্বাসীদের একত্রে আনা যায়।

উপরে লক্ষ্য করুন সব আব্রাহামিক রিলিজিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যাদের উৎপত্তি প্যালেস্টাইন ও সন্নিহিত অঞ্চলে। আর ইন্ডিক বা ভারতীয় ধর্মসমূহ যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনদের শুধু অবিশ্বাসী বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। যদিও আমরা আব্রাহামিকদের অর্থে রিলিজিয়ন মানি না। কিন্তু অবিশ্বাসী বলার অধিকার কে দিল ওদের? এইডস দূরীকরণে এদের তথাকথিত DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) প্রকল্পে অর্থ জোগায় বিল অ্যান্ড মেলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশন ও বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইটালির মদ্যপ্রস্তুতকারক সংস্থা। এই অর্থের কতটা মূল লক্ষ্যে ব্যয় হয় আর কতটা খ্রিস্ট ধর্মপ্রসারে তা কেউ কখনো যাচাই করেনি।

১৯৯৮ থেকে এই সম্প্রদায় মৃত্যুদণ্ড প্রথা বন্ধ রাখার সুপারিশ করেছে। কিন্তু কট্টর শরিয়তি আইন মেনে চলা দেশগুলোতে এমনকী বেসরকারিভাবে মুসলমান সংখ্যাগুরু দেশে শিরোশ্ছেদ, পাথর ছুঁড়ে মারা, জীবন্ত কবর, এসবের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয়নি। এদের মিশন হচ্ছে বন্ধুত্ব করে বাইবেলের গসপেল প্রচার করা; এমন একটা মিশন যা কাউকে বিদেশি মনে করে না। এদের মিশন সীমান্ত ও পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্য দেশে যাওয়া এ একত্রে যুক্ত হওয়া।

এরা তারপর ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গরিবদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে এবং খ্রিস্টধর্মের চাষ করে। তাই ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ লর্ড কেরি বলেছেন আধুনিক চার্চ যেমনটা হবে বলে আমরা চাই এই স্যান্টইজিডিও ঠিক তাই।

মমতা দেশের কেমন উন্নতি করেছেন? তিনি তো মাত্র একটা ছোটো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাও বিগত দশ বছরে একটিও শিল্প স্থাপন হয়নি। রাজ্যের দেনা তার আগের চৌষট্টি বছরের যা হয়েছিল মাত্র দশ বছরে তার তিনগুণ হয়েছে। কর্মসংস্থান শূন্য। এমনকী যেসব সরকারি পদে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিয়োগ হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। নিয়োগের পরীক্ষার পর পাঁচ-ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও মিলছে না বিদ্যালয়ে চাকরি। স্নাতোকোত্তর বা পিএইচডি ডিগ্রিধারী ডোমের পদের জন্য আবেদন করছে!

সামাজিক ন্যায়? শান্তি? সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী যা ভারত পেয়েছে এ যাবৎ সবাই জানে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কিছু বলছে না এক বিজেপি ছাড়া। এখানে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের নির্যাতন গা সওয়া হয়ে গেছে। ধর্ষণ, খুন, জখম, ঘরে অগ্নিসংযোগ, থানা জ্বালানো সব খবর আমাদের নথিভুক্ত আছে। নেত্রীর কড়া হুকুমে পুলিশ মুসলমান অপরাধীদের বিরুদ্ধে সামান্য ব্যবস্থা নেয় না। রাতেদিনে এসব হচ্ছে। আমি পরিসংখ্যান এখানে দিচ্ছি না। চাইলে দেব। কিছু ক্ষেত্রে যখন দেখে মুসলমান অপরাধীকে আর আড়াল করা যাচ্ছে না তখন একজন হিন্দু নিরপরাধী বা সামান্য অপরাধীকেও জড়িয়ে দেওয়া হয় এই অপরাধের রঙ বদলানোর জন্য।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো— কাউকে বিদেশি না মনে করার ছলনার উন্মোচন। সম্প্রতি বিদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের গৃহীত আইন বলবৎ করতে না দেওয়ার পক্ষে যে দেশব্যাপী ভারত এবং হিন্দু বিরোধী শক্তি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তার সামনের সারিতে আছেন এই আধুনিক জারিনা (রাশিয়ার জারের স্ত্রীবাচক শব্দ)। তাই খ্রিস্টান-মুসলমান চক্রের কাছে তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনিই হিন্দুর ছদ্মবেশে সবচেয়ে বেশি হিন্দুবিরোধী। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি তার শক্তি। সবচেয়ে বড়ো শক্তি তার লোভ— ক্ষমতার, অর্থের, যশের এবং অমরত্বের।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

অলিম্পিকে ভারতের ঈর্ষণীয় সাফল্য

সে একদিন ছিল বটে। ভারত অলিম্পিকে যেত আর খালি হাতে ফিরে আসত। ২০১২ সাল থেকে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। সেবার অভিনব বিন্দ্রা ব্যক্তিগত রাইফেল শুটিংয়ে সোনা পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার, ২০২০-র টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতের সাফল্য এক কথায় ঈর্ষণীয়। জ্যাভলিন থ্রোইংয়ে নীরজ চোপড়ার সোনা-সহ মোট সাতটি পদক জয় বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। নিন্দুকেরা হয়তো বলবেন ১২১ জন প্রতিযোগী পাঠিয়ে সাতটি পদক জয়— কী এমন বড়ো কথা! তেমন বড়ো কথা সত্যিই হয়তো নয়। বিশেষ করে ২০১২ সালে ভারত যেখানে ৬টি পদক জয় করেছিল। কিন্তু অ্যাথলেটিক্সে সোনা সব হিসেব গোলমাল করে দিয়েছে। জ্যাভলিন থ্রোইংয়ের মতো কঠিন ইভেন্টে ভারত পদক পাবে, সম্ভবত কেউ কোনওদিন ভাবেননি। টোকিয়োয় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন নীরজ চোপড়া।

সেই সঙ্গে বলতে হবে পিভি সিন্ধু, মীরাবাই চানু, লভলিনা বড়োগোঞাই, রবিকুমার দাহিয়া এবং বজরং পুনিয়াদের কথাও। এরা দেশের হয়ে পারফর্ম করতে নেমে যে-দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার ২০২৮ অলিম্পিকে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের সূচনা করেছিল। দেখা যাচ্ছে ২০২১-য়েই তার ফল ফলতে শুরু করেছে। কিন্তু এই ফলাফল ভবিষ্যতের আরও বড়ো সাফল্যের পূর্বাভাস মাত্র। সুতরাং আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৮ অলিম্পিকের জন্য। মাঝখানে আছে ২০২৪। আমি অন্তত নিশ্চিত ভারত ভালো ফল করবেই। আর সেই ভালো ফলের প্রধান কারিগর হবে মোদী সরকার।

—সুখদেব কর্মকার,
বিরাটি, কলকাতা।

আফগানিস্তানে তালিবান

আফগানিস্তান আবার তালিবানের দখলে। আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করার পরেই আফগানিস্তানের আশি শতাংশ দখল করে নিয়েছে তালিবান। এই নিয়ে দেশের প্রতিটি চ্যানেলে ধুন্ধুমার চলছে। ঘটনাটা আতঙ্কেরই। ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন আফগানরা। মেয়েরা আতঙ্কিত তাদের আবার সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হতে হবে ভেবে। এখন একটা প্রশ্ন সবার মুখে মুখে। আফগানিস্তানের এই পালা বদলে ভারতের আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ আছে কি?

আমার মতে, নেই। কারণ তালিবানদের সঙ্গে ইরানের সংঘাত বাঁধবেই। ইরান শিয়া মুসলমানদের দেশ। তালিবানরা গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। ১৯৯৮ সালে তালিবানরা আফগানিস্তানের ইরানি দূতাবাসের ১১ জন কর্মীকে খুন করেছিল। সেই থেকে ইরানের সাধারণ মানুষ কট্টর তালিবান-বিরোধী। সেবার পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয়েছিল যে ইরান সরকার তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিক পালাবদলের পরেও ইরান তালিবানদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আমার মতে তালিবান ইস্যুতে ভারতের উচিত ইরানকে স্ট্রাটেজিক পার্টনার করে নেওয়া।

—পরমানন্দ দাশ,
ঘাটাল, পশ্চিমমেদিনীপুর।

বিরাট কোহলীদের সাফল্য

ইংলন্ডের মাটিতে তাদের হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত। ১৬ আগস্ট এই খবর পাওয়ার পর স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ আরও বেড়ে যায়। আশা করব ভারত ইংলন্ডকে হারিয়ে সিরিজ জয় করতে সক্ষম হবে। এর আগে রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে ভারত-ইংলন্ড থেকে সিরিজ জয় করে ফিরেছিল। ক্রিকেট মাঠে ইংলন্ডকে হারানোর স্বাদই আলাদা। টিভির সামনে বসে খেলা দেখলেও মনে হয় যেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করছি। সেই কারণেই ১৬ আগস্ট দিনটি এবার দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস হয়ে উঠতে পেরেছে ভারতের কোটি কোটি মানুষের মনে।

—পল্লব ঘোষ,
ভবানীপুর, কলকাতা।

With Best Compliments from-

A Well Wisher

প্রাচীন কাব্যে কালিদাস

সরোজ ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল আকাশে সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় মনোলোভা সরস্বতীর একতম বরপুত্র কালিদাস। কী কাব্যে, কী নাটকে এক অসাধারণ ব্যুৎপত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি। কালিদাসের দক্ষিণ হস্তের পুন্য লেখনি হতে জাত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব সুধাভাণ্ড, যা পান করে রসিক সমাজ আজও মত্ত হয়।

কিন্তু এই কালিদাস কে? তিনি কোথায় কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তা আজও নিশ্চয় করে জানা যায়নি। 'অজ্ঞাত কুলশীলশ্চ' কালিদাসের সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।

সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস মধু কথার মাধুরী ছড়িয়ে কৌতুক রসের আস্বাদ জাগিয়ে বিদগ্ধ জনের জন্য রচনা করেছিলেন, তাঁর অপরূপ বাণী বিগ্রহ কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ঋতুসংহার, মেঘদূত প্রভৃতি শ্রব্যকাব্য ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র দৃশ্যকাব্য। কুমারসম্ভবই আমরা কালিদাসের প্রথম মহাকাব্য হিসেবে জানি। এই কাব্য থেকে উপলব্ধি হয় যে জগতের ভোগই হৃদয়ের চরম প্রার্থণীয় নয়, ভোগ অপেক্ষাও উচ্চতর কাম্যবস্তু আছে, যা হলো ত্যাগ। কবি তাই তাঁর কাব্যে নিষ্কাম শ্মশানচারী শংকর শংকরীর অদ্ভুত প্রেমের কথা লিখেছেন। তাতেও ভোগের গন্ধ নেই, নেই বাসনার লেশমাত্র, হিমালয়ের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অপরূপ দৃশ্য ও স্বর্গীয় প্রেম।

এ তো গেল শুধু কাব্যের কালিদাস। এছাড়া নাটকেও তাঁর লেখানী সমস্ত মনীষী ও সাহিত্যিকগণকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় কাব্যের নানা স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এমনকী প্রকৃতির অতি তুচ্ছ বস্তুও তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়নি, অন্যান্য কবিদের মতো তিনি তাঁর নাটকে কেবলমাত্র নায়ক নায়িকার নিখুঁত বর্ণনা দেননি, অন্যান্য সমস্ত চরিত্রও তাঁর কাব্যে নাটকে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

কালিদাস ছিলেন প্রেমের এক মহান পূজারি। তিনি চেয়েছিলেন— খাদহীন পবিত্র প্রেম। তাই তো আমরা দেখি কালিদাসের মানস কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের গন্ধর্ব মতে বিবাহের পর মিলন হতে দেননি।

কালিদাস যদি কেবলমাত্র শকুন্তলা নাটক লিখেই তাঁর লেখা বন্ধ রাখতেন, তাহলেও বোধহয় তাঁর খ্যাতি সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে কোনোদিনই অম্লান হতো না। সংস্কৃত নাট্য সমূহের মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার এর মধ্যে চতুর্থ অংক অর্থাৎ যেখানে পতিগৃহে যাত্রা যে অংকে বর্ণিত আছে, তাই বলা হয়েছে—

'কাব্যেষ নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা,
তত্রাপি চ চতুর্থোহঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা।'

শকুন্তলার সম্পর্কে মহামতি গেটের একটি প্রখ্যাত উক্তি— 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল কেহ যদি স্বর্গ ও মর্ত্য একত্রে দেখিতে চায়, তবে তাহা কালিদাসের শকুন্তলায় একমাত্র পাইবে'। পাশ্চাত্য কবি বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন যে, 'শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, যে পরিণতির ভাব ফুল হইতে ফলে, স্বর্গ হইতে মর্ত্যে এবং স্বভাব হইতে ধর্মে পরিলক্ষিত করা যায়'।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'ধন্য কালিদাস ধন্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম',প্রলয়ের পূর্বে তোমাদের বিলয়ের কোনো আশা নেই।' এছাড়া কালিদাসের অন্যতম গুণ হলো— 'উপমা কালিদাসস্য'। লেখনীর প্রতি আঁচড়ে আঁচড়ে লিবিবদ্ধ হয়েছে তাঁর অলংকার ভাষা, ভাব, উপমার সমাবেশ, শব্দের মূর্চ্ছনা বর্ণনার আবেগ। এক কথায় শাশ্বত কালের কবি হীরাচুনীপান্না ও গজমোতি দিয়ে কাব্যের মণিমালা গাঁথিয়েছেন।

কিন্তু কাব্যের মণিমালা এখনও মণিমালায় রয়েছে তাতে কোনো খাদ প্রবেশ করেনি। খাদ প্রবেশ করেছে আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে। যা কিনা আমরা কেবল কাব্য ও নাটকের স্বাদ গ্রহণ করি, কিন্তু তার পিছনে যে ওই কাব্য ও নাটক, যার উপর কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সংস্কৃত সাহিত্য কথা আমরা ভুলে গেছি। আজ আমরা ভুলতে বসেছি প্রাচীন বৈদিক মুনি ঋষিদের ভাষা, কথা আরও কত কী। ভুলতে বসেছি বেদ, পুরাণ-এর মাহাত্ম্য, ভুলে গেছি সংস্কৃত সাহিত্যে অফুরন্ত সুধাভাণ্ডকে।

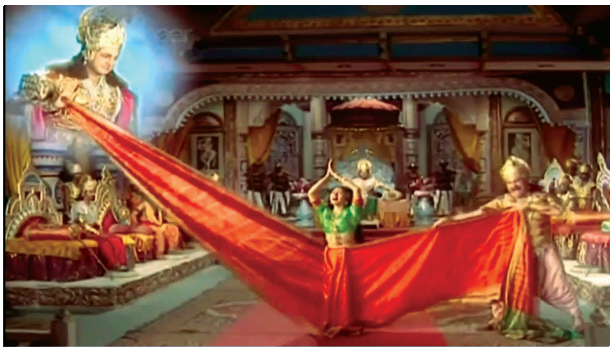

হে সখা

অঞ্জনা পায়রা

কৃষ্ণ ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী পুরুষ, চেনা ছন্দের বাইরে এসে নারীজাতিকে বারে বারে মানুষ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন।

ঋগ্বেদ ও বিভিন্ন পুরাণমতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক মতে রাধার বিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রিয়া আরাধিকা রাধা। দেবী রাধা 'ত্রিপুরা সুন্দরী' মাতারূপে তন্ত্রে পূজিতা হন। তিনি কৃষ্ণের পরমাকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি। তাইতো রাধাকৃষ্ণ একত্রে পূজিত হন সারা পৃথিবী জুড়ে। নারী হিসেবে কেবল নয়, বন্ধু হিসেবে প্রেমকে অসীম মর্যাদার আসনে বসানো— সে তো কৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব। তাই পৃথিবীতে প্রাচীন ভারতের এই দেবপুরুষ চিরন্তন দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে আছেন।

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদী বলেছে—

'তুমি অনাথের নাথ বলে সর্বজনে
চারিকর্মে আমি নাথ তোমার বিহনে
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবে চরণে।

দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ নিজের সখী ও ভগিনী মনে করতেন। দ্রৌপদীর প্রতিটি সংকটে পরম বন্ধু হয়ে পাশে থেকেছেন। পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির হেরে গেলে, দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীর চুল ধরে টেনে আনেন রাজসভায়। পঞ্চপাণ্ডব এমনকী প্রিয় অর্জুনও নীরব ছিলেন। বয়ঃজেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর কেউই কোনো প্রতিবাদ করেননি। সভাজুড়ে তখন নারী শরীরকে বস্ত্রহীন করা, না পাওয়া রমণীধনকে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার উল্লাস। দ্রৌপদী আস্থাভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, 'হে গোবিন্দ, তোমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, তোমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না। এটা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি জীবন ধারণ করেছি।'

ভয়ংকর অপমানের দিনে প্রিয়সখার কাছে অকপটে সাহায্য চাওয়া, যেখানে কোনো রকম অধিকারবোধ নেই। সখা কৃষ্ণই এই সংকটে পরিত্রাতা, বস্ত্রহরণ থেকে পরিত্রাণ পেলেন দ্রৌপদী। কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর সম্পর্কের দিকে তাকালে তাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর ছিল তা অনুভব করা যায়। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে ভীষণভাবে পছন্দ করতেন কিন্তু তার মধ্যে কোনো কাম ভাবনা ছিল না। একজন মহিলার প্রতি কৃষ্ণের সম্ভ্রম চিহ্নিত করে মাতৃজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ। কৃষ্ণ নিজেই বলেছিলেন দ্রৌপদীকে, 'তোমার আমার গায়ের রং একই, নামেও মিল, তুমি কৃষ্ণা আমি কৃষ্ণ। স্বয়ংবরে এসেছিলেন দর্শক হয়ে সেখানে কৃষ্ণ-দ্রৌপদীর পরিচয়। বুঝেছিলেন, দ্রৌপদীর একজন বন্ধু থাকা কতটা দরকার। বস্ত্রহরণে দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করে নারী জাতির মান বাঁচিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

আবারও যখন দুর্যোধন পাণ্ডবদের অপমান করার জন্য বনবাসে থাকার সময় দুর্বাসা ঋষিকে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখনও দ্রৌপদীর সংকটমোচন করেন কৃষ্ণ। অগ্নির কাছ থেকে দ্রৌপদী পেয়েছিলেন একটি পাত্র। সেই পাত্রের খাদ্য ততক্ষণ ফুরাত না যতক্ষণ দ্রৌপদীর না খাওয়া হতো। এটা জেনেই দুর্যোধন দুর্বাসাকে এমন সময় পাঠায় যখন দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে যায়। অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা যখন আসেন, তখন পাত্রে কোনো খাবার ছিল না। যুধিষ্ঠির ঋষিদের নদী থেকে স্নান করে আসতে বলেন। অন্নের কী আয়োজন হবে ভেবে দ্রৌপদী আকুল হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, 'হে দুঃখ নাশক, তুমি এই অগতিদের গতি হও। দ্যুতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে যেমন আমায় বাঁচিয়ে ছিলে, সেইরূপ আজও সংকট থেকে উদ্ধার করো।' বিপদ বুঝে হাজির হন কৃষ্ণ। আরো একবার কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বোন সুভদ্রার বিয়েতে দূত পাঠিয়েছিলেন দ্রৌপদী। তাই প্রিয় বোন সুভদ্রাকে মূল্যবান পোশাক বা গয়না দিয়ে সাজিয়ে তিনি পাঠালেন না। নিতান্ত দীনদুঃখীর মতো পোশাক পরিয়ে দ্রৌপদীর কাছে পাঠালেন যাতে করে দ্রৌপদীর অহংরক্ষা হয়। সুভদ্রাকে হাসিমুখে বরণ করেন দ্রৌপদী। নিজের পোশাক ও গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেন তাকে।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী, বন্ধুত্বের সম্পর্কে দ্রৌপদীর ছিল কৃষ্ণের প্রতি ভীষণ নির্ভরতা। অসম্ভব বিশ্বাস। আর কৃষ্ণের ছিল দ্রৌপদীর প্রতি চরম দায়বদ্ধতা। কৃষ্ণ ১৬১০০ নারীকে একসঙ্গে বিয়ে করে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই ১৬১০০ কুমারীকে নরকাসুর অপহরণ করে তার প্রাসাদে বন্দি করে রেখেছিলেন। তারা অধিকাংশ ছিলেন ঋষিকন্যা, সনাতনা যুবতী। কৃষ্ণ নরকাসুরকে আক্রমণ করে হত্যা করেন এবং সমস্ত বন্দি নারীকে মুক্ত করেন। তারা যেহেতু নরকাসুরের কাছে বন্দি ছিলেন। তৎকালীন সমাজে তাদের বিয়ে অসম্ভব ছিল। কৃষ্ণ তাদের সম্মান বাঁচাতে সকলকে বিয়ে করলেন। এবং সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথিবীর সর্বকালীন ইতিহাসে এই নারী সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা বিরল ঘটনা। তিনি মানব সমাজকে এই বিয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন, যে কোনো সমাজে নারীরা সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রতীক।

জন্মের পরেই শিশুকে স্তন দান করা উচিত

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক,

শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার কমাতে মহকুমা স্তরের হাসপাতালেও এখন তৈরি হয়েছে নবজাতক ইউনিট। সদ্যোজাতদের চিকিৎসা করার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যয়সাধ্য হওয়া সত্ত্বেও, জেলার প্রতিটি প্রধান হাসপাতালে তার ব্যবস্থা করার এক মস্ত কর্মকাণ্ড চলছে। নতুন নতুন যন্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স জোগানো হচ্ছে। নবজাতক ইউনিটের বাইরে যে শিশুরা জন্মাচ্ছে, তাদের নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনও কম নয়। নবজাতকদের সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে গোড়ার কিছু নিয়ম না মানলে তাদেরও সংকট দেখা দিতে পারে। বিশেষত শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া (হাইপোথার্মিয়া), তা থেকে নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট হয়ে জীবন সংকট আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। এই অবস্থা থেকে শিশুকে বাঁচানোর সহজ, ব্যয়হীন পদ্ধতি হলো শিশু জন্মানোর পরেই স্তন্যপান শুরু করিয়ে দেওয়া। মায়ের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকলে শিশুর শরীর গরম থাকে, ঠাণ্ডা লাগে না। স্তন্যপানের ফলে পুষ্টি পাওয়ায় শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যপান শুরু এবং ছ'মাস অবধি কেবল স্তন্যপানের পরামর্শই দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সহ বহু আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংগঠন। এ দেশের স্বাস্থ্যনীতিও তাই বলে। কিন্তু সব হাসপাতালের কি সব সময়ে যথাসম্ভব শীঘ্র স্তন্যপান শুরু করানোর নীতি মান্য করা হচ্ছে? সে বিষয়ে খটকা থেকেই যাচ্ছে। এদেশে এখন অধিকাংশ শিশু জন্মাচ্ছে হাসপাতালে, কিন্তু জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে স্তন্যপান শুরুর হার ২৫ শতাংশও নয়। তাই প্রশ্ন উঠছে, ডাক্তার-নার্সরাই কি তবে সর্বত্র স্বাস্থ্যনীতি মানছেন না? আসলে বিভিন্ন হাসপাতালে নানা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কিছু সাবেকি অভ্যাস রয়েই গেছে। যেমন লেবার রুমে প্রসবের পর শিশুকে পরিষ্কার করে অন্যত্র ছোটো খাটে দেওয়া। প্রসবের পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো যতক্ষণ না শেষ করে লেবার রুম থেকে ওয়ার্ডে ফিরে যাচ্ছেন মা, ততক্ষণ শিশু তার কাছে আসছে না ফলে মায়ের কাছে আসার আগে একঘণ্টারও বেশি কেটে যাচ্ছে। অথচ এখন চিকিৎসকদের মত হলো, নাড়ি কাটার আগেই মায়ের বুকে শিশুকে দিয়ে দেওয়া এবং অন্তত দু'ঘণ্টা সেখানেই রাখা দরকার। বহু বেসরকারি নার্সিংহোম, এমনকী কিছু কিছু হাসপাতালেও শিশুকে গোড়াতেই বোতল দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে স্তন্যপানের যে জন্মগত প্রবৃত্তি শিশুর থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। পরে স্তন্যপান করাতে চাইলে শিশু তা চায় না। এক্ষেত্রে বিপরীত ফল হচ্ছে।

হাসপাতালে প্রচলিত বিধিগুলোকে তাই বদলাতে হবে। যে শিশুদের জন্মের সময়ে শ্বাসকষ্ট নেই। তাদের লেবার রুমেরই যাতে মায়ের কাছে দিয়ে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আশার কথা, আগের চাইতে এখন এর প্রচলন অনেক বেড়েছে। কিন্তু সব হাসপাতালে, এটাকে নিয়ম করে তুলতে এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তার প্রয়োজন আরও এই কারণে যে, শিশু জন্মের পরেই স্তন্যপান শুরু করলে তা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ছ'মাস কেবল স্তন্যপানের বিধি মানা হবে কি না, তার অনেকটাই নির্ভর করে জন্মের পর প্রথম ঘণ্টার উপর। স্তন্যপান যে কেবল শিশু পুষ্টির বিষয় নয়, শিশুসুরক্ষারও বিষয়, তা এতদিনে প্রমাণিত। বছর পাঁচেক আগে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল কতটা গুঁড়ো দুধে কতটা জল দিতে হয়, তা মাত্র চার শতাংশ মা ঠিকঠাক জানেন। চুয়াল্লিশ শতাংশ মা বলেছিলেন, তাঁদের কোনও ধারণাই নেই। সেই সঙ্গে, বোতল ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত করা কঠিন, খরচ সাপেক্ষও বটে।

ফলে হাসপাতালেই শিশুর মুখে বোতল দিলে শিশুকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়া হয়। তাহলে কী করা উচিত একটু দেখা যাক :

(১) প্রসবের পরে নাড়ি কাটার আগেই মায়ের বুকে দেওয়া।

(২) শিশুর জন্মের পরেই স্তন্যপান শুরু করানো।

(৩) ছ'মাস অবধি কেবল স্তন্যপান।

(৪) জন্মের পর শিশুকে আলাদা বিছানায় রাখা চলবে না।

(৫) জন্মের পর শিশুকে মধু, তালমিচ্ছরি, জল, বোতলে দুধে দেবেন না।

(৬) স্তন্যপানের সঙ্গে কৌটোর দুধ খাওয়াবেন না।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ভারত আলোর পথযাত্রী। অনন্ত অনাদি অতীত থেকেই। আলোর সাধনাতেই মগ্ন ভারত জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই। ভারত চায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে। দিব্যজোতিতে মিশে যেতে তার সেই আন্তরিক আর্তিই মন্দ্রিত উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে— তমসার যবনিকা সরিয়ে নাও। অন্ধকারের পরে আছে যে আলোর দেশ, নিয়ে চলো আমাকে সেখানে। মিলিয়ে দাও, মিশিয়ে দাও নিঃশেষ করে দাও সেই আলোতেই।

এমন আলোক-ভিখারি বলেই তাদের কাছে কৃষ্ণপক্ষ বড়ো প্রিয়। ভারত জানে অমবস্যার নিশা অবসানে প্রতিপদের আকাশেই দেখা দেয় বাঁকা চাঁদের আভাস। তারই মধ্য দিয়ে মেলে আশ্বাস সেই পরমের— আসছি— আলো নিয়ে সব অশুভ--- সব দুর্নীতি, সব অবিচার-অত্যাচারের সব মলিনতা ধুয়ে মুছে শুভের আরতি প্রদীপ জ্বালাতে। তাই তো কৃষ্ণপক্ষেই হয়— মহাকালীর আরাধনা। তাই তো এই কৃষ্ণপক্ষেই ভারত-আত্মা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

প্রতিশ্রুত তিনি— যখনই দানবশক্তি হবে প্রবলতার মোহে মত্ত, যখনই মাথাচাড়া দেবে অধর্ম, অশুভের অন্ধকারে ভরে যাবে চারিদিক, বিপন্ন হবে স্বাধীনতা— তখনই আসবেন তিনি— ধর্মসংস্থাপনায়। তাই তো দ্বাপরে যখন কংসের মতো দানবের অত্যাচারে এই পৃথিবী প্রপীড়িত— তখনই হলো তাঁর আবির্ভাব।

তাঁর সেই আবির্ভাবের পটভূমিটিও তাই ঝঞ্ঝাবহুল। পাপের জ্বাল ছিঁড়বেন বলেই আবির্ভাব তাঁর কংসকারাগারে--- শৃঙ্খলিত বাবা-মা বসুদেব দেবকীর কোলে। সকলকে আলোর দিশা দেখাবেন বলেই আগমনের সময় হিসেবে বেছে নিলেন শ্রাবণী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিটিকে। তিনি অবতার পুরুষ। আবার তিনিই ভারতাত্মা— কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। অষ্টম অবতার হিসেবে তিনি হলেন মায়ের অষ্টম গর্ভজাত। অষ্টমী হলো তাঁর জন্মতিথি। এ এক আশ্চর্য সমাপতন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই আবির্ভাব তিথিটিই জন্মাষ্টমী। সব ভারতীয়--- বিশেষ করে বৈষ্ণবদের এক মহাপুণ্যতিথি। অষ্টোত্তর শতনাম অর্থাৎ ১০৮ নামের মালায় বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁর আবির্ভাব তিথিটি ভক্ত ভারতীয়দের কাছে নানা নামে চিহ্নিত। সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বলা হলেও ভারতের নানা প্রান্তে এর নানা নাম। কোথাও বলা হয় গোকুলাষ্টমী, কোথাও বা সাতম অথাম, কোথাও অষ্টমী রোহিণী, আবার কোথাও বলা হয় শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী বা শ্রীজয়ন্তী কিংবা যদুকুলাষ্টমী।

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন কংস-শিশুপালের মতো দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য। তাঁর আবির্ভাবভূমি মথুরা। শৈশব ও বাল্য লীলাভূমি গোকুল ব্রজভূমি ও বৃন্দাবন এবং রাজা হয়ে বসেন তিনি দ্বারকায়। মধুরা বৃন্দাবন ও গোকুল পাশাপাশি বলেই এনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্র হিসেবে তিনটি স্থানের উল্লেখ করা হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এই স্থানগুলি পরম তীর্থভূমি।

প্রসঙ্গত, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে বিষ্ণুর উপাসক হিসেবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলেও উপাস্যের অবতার ভেদে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মূলত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। রামায়েত এবং কৃষ্ণায়েত। আর্যাবর্তে এই দুই সম্প্রদায়ের ভক্তের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। তবে ভিন্ন ভিন্ন নামে দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার কৃষ্ণের ভজনা তুলনায় বেশি।

রাম ও কৃষ্ণ— দুজনেই বিষ্ণুর অবতার। সেদিক থেকে দুজনেই ঐতিহাসিক পুরুষ। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা শ্রীকৃষ্ণের একটি জন্ম-তারিখ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে মথুরায় কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৮ জুলাই। সেদিন ছিল মুখ্য চান্দ্র শ্রাবণ বা গৌণভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। হিন্দুর আচারে জন্মদিন নয়, পালিত হয় জন্মতিথি। সেই হিসেবে ২০২১-এর ৩০ আগস্ট জন্মাষ্টমীতে পালিত হবে শ্রীকৃষ্ণের ৫২৪৮তম জন্মতিথি।

জন্মাষ্টমী এক অখিল ভারতীয় উৎসব। তাই বা কেন, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশেও বেজে ওঠে জন্মাষ্টমীর ঘণ্টা। ভারত-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন

বিশ্বদেবতা। তাঁর জন্মতিথি শুভ জন্মাষ্টমী এক দৈবী মহিমায় সকলকে বেঁধে ফেলে শুভ বোধ, একাত্মতা ও সংহতির সুতোয়। বিশ্বজুড়ে পাতা রয়েছে আজ জন্মাষ্টমীর পুজোর আসন। সর্বত্রই রণিত কৃষ্ণনামের সুর। তারই মধ্যে ব্রজভূমি মথুরা-বৃন্দাবনের চারিদিকে জন্মাষ্টমীর পুণ্যমূহূর্তে যেন ছড়িয়ে পড়ে অমরার পারিজতের সুবাস। সারা শ্রাবণ মাসজুড়ে আয়োজনের ব্যস্ততা চারিদিকে। বিশেষ করে শেষ সপ্তাহে। সব প্রস্তুতি পূর্ণতার রূপ পায় জন্মাষ্টমী এবং পরদিনের নানা অনুষ্ঠানে।

বৃন্দাবন

কৃষ্ণ-কীর্তনে মুখরিত জন্মাষ্টমীর রাতে হয় মাখন-চোর বালগোপালের মহাভিষেক। দুধ-দই-হলুদ ঘি এবং আরও নানা উপাচারে হয় বিগ্রহের মহাস্নান। তার পর পরানো হয় কৃষ্ণমূর্তিকে নানা রত্ন-শোভিত দিব্যবস্ত্র। নানা আভরণে দেববিগ্রহ তখন ভোরের সূর্যের মতোই স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল। রত্নসিংহাসনে স্থাপিত কৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন মূর্তি দেখে ভাববিহ্বল ভক্তকণ্ঠে শুধু একটিই ধ্বনি— 'জয়শ্রীকৃষ্ণ'। হরিনাম সংকীর্তনে সে এক অপূর্ব ভাবঘন অলৌকিক পরিবেশ।

দেবতা তিনি। তবুও জন্ম তাঁর মথুরায় আঁধারঘেরা কংস- কারাগারে। যমুনার তীরে আজও আছে সেই কারাগার--- নাম যার কৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির। মন্দিরময় মথুরা। ছোটো বড়ো মিলিয়ে শ' চারেকের বেশি কৃষ্ণমন্দির। জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে নানা রঙের আলোকমালায় সেজে ওঠে সেইসব মন্দির। কৃষ্ণপক্ষের নিকষ-কালো রাত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আলোর দ্যুতিতে। মথুরা জুড়ে সে এক মায়াবী পরিবেশ।

অন্যসব জায়গার তুলনায় ব্রজভূমির জন্মাষ্টমী ভাবসম্পদে যেন একটু আলাদা। মথুরায় এই উৎসবে রয়েছে এমন দুটি বৈশিষ্ট্য যার দেখা মেলে না আর কোথাও। ওই দুটি পূজা-উৎসবের অঙ্গ হলো 'ঝুলন' ও 'ঘাটা'। সারা শ্রাবণ মাস ধরে এর ব্যাপ্তি।

ঝুলন উৎসবে মন্দির প্রাঙ্গণে ঝোলানো হয় সুসজ্জিত দোলনা। শুধু মন্দির নয় মথুরাবাসীদের গৃহাঙ্গণেও টাঙানো হয় নানা রকমের দোলনা। কোথাও কোথাও এগুলি সাজাতে ব্যবহার করা হয় সোনা-রুপোও। তবে সব জায়গাতেই দোলনার দড়িগুলি ফুলে ফুলে ঢাকা। এসবই হলো শিশুকৃষ্ণকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর প্রতীক। 'ঘাটা'-তে ব্যবহার করা হয় পছন্দসই কোনও একটি রং। সে রং হতে পারে শ্রীকৃষ্ণের পীত বসনের মতোই হলুদ। ওই একটি রঙেই রঙিন করে তোলা হয় মন্দির, বিগ্রহের আসন-পীঠ এমনকী তাঁর পরিধেয়ও। গৃহস্থদের বাড়িতেও সেই একই রঙের বিভা। সব মিলিয়ে মথুরায় তখন শুধুই রঙের বাহার। এই দুটি ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ঝাঁকি বা ট্যাবলো নিয়ে শোভাযাত্রা। বিষয় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে বাল্যলীলার নানা রঙ্গকথা। তবে শুধু মথুরা নয়, এই ধরনের ট্যাবলো শোভাযাত্রা বা ঝাঁকি প্রদর্শনী হয় বৃন্দাবনেও। জন্মাষ্টমী উৎসবের আরও একটি পরিচিত অঙ্গ রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা নিয়ে নাট্যাভিনয়। অনেক সময় পেশাদার শিল্পীরাও অভিনয় করেন এইসব নাটকের নানা ভূমিকায়।

উপবাস, রাত্রিজাগরণ আর কৃষ্ণকথা শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান হলো জন্মাষ্টমীর অন্যতম করণীয়। রাতে শ্রীকৃষ্ণ পূজার পর প্রসাদ গ্রহণ। ভঙ্গ উপবাস। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। বালগোপালকে পেয়ে গোপরাজ নন্দের আনন্দ উল্লাসের অনুকরণে নাচ-গান। 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল'। তাই জন্মাষ্টমীর ভোগে থাকে তালের বড়া, মালপোয়া ও আরও নানা মিষ্টি মিঠাই। এই দিন শ্রীকৃষ্ণের ভোগে দেওয়া ছাপ্পান্ন রকম পদ। তাই এর নাম ছাপ্পান্ন ভোগ। জন্মাষ্টমীর পরদিনের উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ারঙ্গ 'দধি হাঁড়ি'। বালক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী গোপবালকদের নিয়ে দই এবং মাখন চুরি করে খেতেন। সেই ঘটনার অনুকরণেই অনেক উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয় দই এবং মাখনের হাঁড়ি। ছোটো ছোটো ছেলে এবং কিশোর তরুণরা একে অন্যের পিঠে উঠে তৈরি করে এক বিরাট উঁচু মানব-পিরামিড। একবারে ওপরে থাকে যে ছেলেটি তাকে বলা হয় 'গোবিন্দ'। গোবিন্দর কাজ হচ্ছে ঝোলানো দই-মাখনের হাঁড়িটি থেকে ফেলা। এটা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতাও হয়। সফল দলকে দেওয়া হয় আর্থিক পুরস্কারও।

এই ভাবে পুজো অর্চনা, কীর্তন, রাসলীলা প্রদর্শন, ক্রীড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ হয় মথুরার জন্মাষ্টমী উৎসব। যার সঙ্গী হতে দেশ বিদেশ থেকে আসেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। প্রতিবছর মথুরা-বৃন্দাবনের জন্মাষ্টমী দর্শনে ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ মানুষ আসেন কোনো কোনো বছর।

মথুরার মতো বৃন্দাবনেও জন্মাষ্টমী পালন করা হয় মহাসমারোহে। হাজার পাঁচেক কৃষ্ণমন্দিরের শহর বৃন্দাবনেও একই নিষ্ঠায় এবং জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় জন্মাষ্টমী উৎসব। উৎসবের অঙ্গ হিসেবেই যমুনার তীরে মধুবন বা নিধুবনে হয় রামলীলার অভিনয়। পুরাণ মতে এই মধুবনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বল্যলীলায় গোপিনীদের সঙ্গে রাসনৃত্যে মেতেছিলেন রাধা ও অন্যান্যদের সঙ্গে। ভক্তের বিশ্বাস, এ হলো নিত্যলীলা। এখনও প্রতিরাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ওই রাজলীলা করে থাকেন। তাই সন্ধের পর সেখানে কেউ যায় না। রাসলীলাও শেষ হয় এখানে সন্ধের আগেই।

ব্রজভূমির মতোই সমান উৎসব উদ্দীপনা নিয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাট,রাজস্থান, গোটা উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, পূর্ব ও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতেও জন্মাষ্টমী পালিত হয় মহাসমারোহে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ফিজি, মালাকর ইত্যাদি জয়গাতেও পূজিত হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই ভাবে। এখন তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনেও পালিত হয় জন্মাষ্টমী।

শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিপরায়ণ, মানুষের লাঞ্ছনাকারী শোষক এবং স্বাধীনতা হরণকারীদের সংহারক। অশুভের বিনাশ আর শুভের উদ্বোধন তাঁর কাজ। তিনি শুধু ভারতাত্মা, অবতার পুরুষ ভগবান নন— তিনি হলেন সুশাসন এবং স্বাধীনতার প্রতীক। তাই তাঁর জন্মোৎসব জন্মাষ্টমী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ এক অনুষ্ঠান।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ

মহন্ত যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ

সমগ্র বৈষ্ণব শাস্ত্রে জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে অষ্টম সংখ্যাটি বৈষ্ণব শাস্ত্রের একটি রহস্যময় সংখ্যা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম গর্ভের সন্তান। ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে তার জন্ম। আবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ৮ × ২ = ১৬টি শব্দ ও আটটি ফেজ বা ধাপে সম্পূর্ণ। এই রহস্যঘন তত্ত্ব অবশ্যই ভবিষ্যতে বিশ্লেষিত হবে, তবে তার আগে আজ আমরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার বহুচর্চিত লীলা পুরুষোত্তম চরিত্রটির দুটি দিক আধুনিক দর্শনের নিরিখে আলোচনা করব।

সাধারণ ভাবে আমরা যে ব্রজের রাখালরাজা কানাইকে জানি, সেই গোপাল বা শ্রীকৃষ্ণ কি একটি মাত্রই চরিত্র নাকি ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে, বিভিন্ন পুরাণকারের ব্যাখ্যায় একাধিক কৃষ্ণ চরিত্র একভাবনায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে?

এক কানহা বসুদেব কা বেটা,
এক কানহা ঘট ঘট মে ব্যায়ঠা,
এক কানহা কে সকল নিহারি,
অউর এক কানহা তো জাউ বলিহারি।

সমগ্র সনাতন অধ্যাত্ম শাস্ত্রই বহুরৈখিক বা একাধিক ব্যাখ্যাসম্মত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ থেকে বেদ পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রই, বিভিন্ন সময়ে নানা মুনি নানা মতে বিশ্লেষণ করলেও এই সমস্ত আলোচনাকে চারটি পটভূমিতে ভাগ করা যায়।

১. ঐতিহাসিক।
২. আধ্যাত্মিক।
৩. মনস্তাত্ত্বিক।
৪. পৌরাণিক বা দার্শনিক।

তবে এই বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে ভগবান পুরুষোত্তমের আজ শুধু প্রথম দুটি দিক নিয়েই এগোবো।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজকের সময় পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আচার-আচরণ সম্বলিত সত্যনিষ্ঠ বর্ণনাই ইতিহাস। আজ থেকে মাত্র হাজার বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া ও বিশ্বের তথাকথিত কিছু স্বঘোষিত মাতব্বরের অনুমোদিত বিষয়গুলো প্রকৃত ইতিহাস আর বাকি সব কিছু কল্পনার গল্পগাথা— এসব কথা আমরা শুনবোই বা কেন? মানবোই বা কেন? প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস তো মহাকাব্য, পুরাণ, উপনিষদগুলিই। তাই ঐতিহাসিক ভাবে আজ থেকে প্রায় ৩৬০০ বছর আগে মনে করা হয় মহাভারতের যুগ। আর সেই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন কৃষ্ণ নামক রহস্যময় ঐতিহাসিক চরিত্রটি। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষের পরিধি ছিল পামির মালভূমি থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ বর্তমান চীন, সাইবেরিয়া। দক্ষিণের দিকে ভারত মহাসাগর। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর আর পূর্বে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। এই বিশাল ভূখণ্ড অসংখ্য ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী, ছোটো ছোটো দেশে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আদর্শগত সংঘর্ষ নয়, সাম্রাজ্যলিপ্সা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, অতিরিক্ত আত্মস্বর্বস্বতা— এইসব কারণেও প্রতিনিয়ত এরা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। তৎকালীন মথুরানরেশ ও দ্বারকাধীশ ঐতিহাসিক কৃষ্ণ দেখলেন, এই ছোটো ছোটো দেশগুলিকে, এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে, বৃহত্তর জনকল্যাণে সংযত করে একটি সার্বভৌম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরি করা গেলে, শুধু শুভবোধ সম্পন্ন ধার্মিক মানুষরাই নয়, যারা অধার্মিক তাদেরও সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ নীতির মাধ্যমে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং রাষ্ট্র সার্বভৌম একতার মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত থাকবে। তাই তিনি মহাভারতের মতো একটি ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। যার ফলে, যুধিষ্ঠিরের মতোন সুচিন্তিত রাষ্ট্রনায়কের হাতে, ভারতবর্ষ নামক সুবিশাল ভূখণ্ডকে অর্পণ করে, রাজনৈতিক স্থিরতা এবং প্রজাদের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে, সার্বভৌম সম্রাটের ভূমিকা তৈরি করতে পেরেছিলেন।

ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে মথুরা, বৃন্দাবন সমেত তৎকালীন সমগ্র উত্তর ভারত ও বর্তমানে সামুদ্রিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত আরব

সাগরের গর্ভে দ্বারকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। মহাভারত-সহ সমগ্র ভাগবৎ পুরাণের বর্ণনায় আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। আর এখানেই ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে মথুরানরেশ, দ্বারকাধীশ বাসুদেব কৃষ্ণের স্বার্থকতা।

আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ

অধ্যাত্ম্য কাকে বলে? এই একই প্রশ্ন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'কিম্ তৎ ব্রহ্ম কিমাধ্যাতম্।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন--- হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম্য কী?

প্রত্যুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ মুচ্যতে।'

অর্থাৎ, ভগবান বললেন নিত্য বিনাশরহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই আত্মার অবস্থিতিকে অধ্যাত্ম বলে। সহজ করে বললে, প্রতিটি জীব এক-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে যেমন অসংখ্য গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ আছে, তেমনি প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই তার অণু-পরমাণুতে, অসংখ্য কোটি কোটি এইরকম ছায়াপথ, গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার গ্যালাক্সি, নেবুলা রয়েছে। তাই জীবকে সনাতন শাস্ত্রে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব কী? প্রসারিত হওয়া। যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বিগব্যাং থিয়োরি বলে। কিন্তু এই ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম লক্ষ্য কী? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে পরম পুরুষের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে, মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ডের সেই বহির্মুখী গতির বিপরীত গতি প্রাপ্ত হওয়া বা ঈশ্বর অভিমুখী ক্রমসংকোচনের (Big Crunch) মাধ্যমে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরে লীন হওয়া যাকে বলা হয় ব্রহ্মলীন হওয়া। আর তার জন্য জীবরূপী ব্রহ্ম যে স্বভাব রচনা করেন তাই অধ্যাত্ম্য ও সেই বিষয়ক চর্চা আধ্যাত্মিক।

এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণ কেমন?

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত—

'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।'

কৃষি ভূবাচক শব্দ থেকে হয় কর্ষণ বা আকর্ষণ করা, টানা। কৃশ ধাতুর অর্থ হলো 'আমি আছি' এই বোধ। তোমাদের সকলের মধ্যে সেই একমাত্র আমিই আছি, এই রকম একটা বোধ বা 'অহং অস্মি' 'I Exist'— এই রকম ভাবনা। আর ভূ ধাতুর অর্থ হলো কোনো কিছু হওয়া, থাকা। সেই ভাবে কৃষির্ভূ শব্দটির অর্থ হলো কৃষ্ণের আকর্ষণেই সব কিছু আছে, সবকিছু হচ্ছে। তিনিই সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বা 'কৃ' অক্ষরবাচক। নশ্চ হলো নিবৃত্তি বাচক শব্দ যার অর্থ হলো, যা পেলে আর কোনো কিছু পাওয়া অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার নিবৃত্তি ঘটে। এই দুই এর সংযোগে, কৃ + নশ্চ = কৃষ্ণ। তিনি হলেন পরম পুরুষ। সর্ব ভূতের মধ্যেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন শ্যামের শক্তি শ্যামা রূপে, আর তাই দেবী ভাগবতে দেবীস্তুতিতে পাই, 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'। সমস্ত জীব, জড় ও অব্যক্ত জগতে একমাত্র তিনিই আছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তার উপস্থিতি, উজ্জ্বলতা, স্বকীয়তা তিন ভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ রূপে। তাই তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

সৎ কাকে বলে? যা নিত্য, যা শাশ্বত তাকেই সৎ বলে। যিনি কোনো কিছুর দ্বারা বাধিত হন না, যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই তিনকালে একই রকমভাবে বিদ্যমান থাকেন, তাকেই সৎ বলে অথবা বলা যেতে পারে জন্মের পূর্বে জন্মের পরে এবং ধ্বংসের বা মৃত্যুর পরে যিনি একই রূপে বর্তমান থাকেন তিনি সৎ। যেমন জগতের সমস্ত বস্তুই তার বস্তু রূপ লাভ করার আগে পর্যন্ত থাকে না এবং সে বস্তুটি যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বা তার মৃত্যু ঘটে, তারপরও সে থাকে না, কেবল সে বস্তুটির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যিনি ওই তিনকালেই সমানভাবেই বিদ্যমান থাকেন তিনিই সৎ। তাই এই ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। তার ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই, অপচয়-উপচয় নেই। এই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার গীতার বাণীতে বলেছেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।
(২/২০)

এই ব্রহ্ম যেমন সৎ তেমনি চিৎস্বরূপও। যিনি অন্য কোনো সাধনের অর্থাৎ অন্য কোনো বস্তু বা কার্যের অপেক্ষা না করেই স্বয়ং নিজের শক্তিতেই নিজে প্রকাশমান থাকেন এবং নিজের মধ্যেই আরোপিত সমস্ত পদার্থের অবভাসক বা প্রকাশক হন তিনি চিৎ। অর্থাৎ এই যে ভগবান যিনি নিজে নিজেই প্রকাশিত হন এবং অন্য সমস্ত বস্তুকেও প্রকাশিত করেন তাই তিনি চিৎ। যেমন সূর্যকে দেখার জন্য অন্য কোনো আলোর প্রয়োজন হয় না, সূর্য নিজেই নিজের প্রকাশক এবং জগতের অন্য সমস্ত বস্তুকেও প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সূর্য কার তেজে তেজিয়ান? কার জ্যোতিতে স্বয়ং সূর্য জ্যোতিষ্মান? স্বয়ং অধ্যাত্ম্য পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

'ন তদ্ভাসায়তে সূর্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।
(গীতা-১৫/৬)

আমার সেই স্বয়ং প্রকাশময় পরমপদকে সূর্য প্রকাশিত করতে পারে না, চন্দ্র প্রকাশিত করতে পারে না আর অগ্নিও প্রকাশিত করতে পারে না। সমস্ত জীব আমার সেই চিৎময় পরমপদ প্রাপ্ত হয় আর সংসারে ফিরে আসে না, সেইটিই আমার পরম ধাম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে তার পরমপদ গোলকধামের আত্মজ্যোতি স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি সৎ এবং চিৎ বা চেতনাময়। একই সঙ্গে তিনি পরমানন্দ বিগ্রহ।

মানুষ সর্বদা সুখান্বেষী। শুধু মানুষ কেন সৃষ্টির সূক্ষ্মতম স্তর থেকে স্থূল তম স্তর পর্যন্ত সবাই যে বেঁচে আছে তা শুধু বাঁচার আনন্দে। এই বাঁচার আনন্দ না থাকলে কেউ বেঁচে থাকতে চাইতো না, যেভাবেই হোক এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতো, থাকত না। বাঁচার মধ্যে আনন্দ আছে। সবাই চায় বাঁচবো,

হাসবো, খেলবো, নাচবো, কাজ করব, দেখবো, পাবো আবার পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে আনন্দে মিশে থাকবো। এই যে বাঁচা, এই বাঁচার নামই আনন্দ।

শাস্ত্র বলছে,—

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ।।

ন বা অরে পুত্রানাং কামায় পুত্রা: প্রিয় ভবন্তি ।

আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়া ভবন্তি ।।

ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।।'

পতিকে ভালো লাগে কেন? পতি প্রিয় কেন? পতিকে ভালোবেসে নিজে আনন্দিত হই বলে পতি প্রিয়। পতির জন্য পতি প্রিয় নয়। তেমনি পুত্রের আকর্ষণে পুত্র প্রিয় নয়, পুত্রকে ভালোবেসে নিজের ভালো লাগে বলে পুত্র প্রিয়। তেমনি যে সব কিছু পেয়ে, করে, আমাদের ভালো লাগছে তা সেই পাওয়া বা কৃত বিষয়ে নেই, আমার নিজের সেই বিষয় ভালো লাগছে, আমি তার মধ্যে বাঁচার আনন্দ পাচ্ছি, তাই সেটি ভালো লাগছে।

কিন্তু এই যে সবকিছু চাওয়া, পাওয়ার মধ্যে আনন্দ তা তো ক্ষণিকের। সর্বক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দপ্রাপ্তি ঘটে একমাত্র সেই পরমানন্দ পরম পুরুষোত্তমকে পাওয়ার পরে। কারণ তিনিই সমস্ত আনন্দের উৎস নন্দেরও নন্দন সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শুরুতেই বলেছি কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবান শব্দের তাৎপর্য কী?

ভগবান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, ভগ + বান দিয়ে। এখানে 'ভ' অক্ষর বলতে, 'ভেতি ভাসয়তে সর্বান লোকান্' ইতি 'ভ'।

যিনি সর্বলোক (ভূ, ভূব, স্ব, তপ, জন, মহঃ, ব্রহ্ম এই সপ্তলোক বা ব্রহ্ম থেকে স্থূলতম জড় পদার্থ সবকিছুর বিকাশের সাতটি স্তর)-কে বাঁচার আনন্দে উদ্বেলিত, উদ্ভাসিত করে রেখেছেন।

আর 'গ' অক্ষর বলতে,'গচ্ছতি যস্মিন আগচ্ছতি যস্মাৎ' ইতি 'গ'।

অর্থাৎ এই বিশ্বের সবকিছুই যার থেকে বেরিয়ে আসছে ও আবার সেই সবকিছু শেষ পর্যন্ত তার মধ্যেই মিশে যাচ্ছে। এই দুটি নিয়ে 'ভগ' যা ৬টি গুণের (ঐশ্বর্য বা Occult Power, প্রতাপ বা Administration, যশ বা Ultimate Fame, শ্রী বা Charm of Fascinating Faculty, জ্ঞান বা Subjectivisation of Objectivity, বৈরাগ্য বা Detachment from Materialistic World) সমন্বয়।

তাহলে 'ভ' আর 'গ' এই দুটি মিলে হলো 'ভগ' আর এর সঙ্গে 'মতুপ' প্রত্যয় যোগ করে প্রথমার একবচনে 'ভগবান' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। কৃষ্ণের সমগ্র জীবন পর্যবেক্ষণ করলে ও সমসাময়িক সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ঋষি, মুনি, দার্শনিকদের তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ ও মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'ভগ'-এর সমস্ত গুণগুলি তিনি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। জনসাধারণের সামগ্রিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'অবতরণং করোতি যঃ সঃ অবতারঃ'। বিষম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, দুরবস্থার চাপে মানবাত্মা যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে, আকুল হয়ে ভগবানের কাছে 'রক্ষা করো', 'ত্রাহিমাম্' বলে আকুতি জানায়, তখনই পরমপুরুষ মানবতাকে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে মহামানব বা মহাসম্ভূতি রূপে এই মৃত্যুলোকে অবতরণ করেন, আর তাই তিনি অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু অবতীর্ণই হননি, তিনি চিরকালের জন্য মানবাত্মাকে অভয় দিয়ে গিয়েছেন,

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।
তাই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

দুই মা এক সন্তান

অনন্যা চক্রবর্তী

মা দেবকী এবং মা যশোদা। সন্তান একজনই, তিনি কৃষ্ণ। কখনও কান্‌হা, কখনও লাল্‌হা। মা ও সন্তানের এ এক বিচিত্র কাহিনি। দেবকী কংসের কারাগারে বন্দি। কংসের অত্যাচারে জর্জরিত ধরিত্রীর কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন দেবতারা। দৈববাণী হয়েছে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে হত্যা করে ধরিত্রীকে স্বস্তি দেবেন। ক্ষিপ্ত কংস প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পরপর হত্যা করেছে দেবকীর সাতটি সন্তানকে। অষ্টমবারের জন্য গর্ভবতী হয়েছেন দেবকী। কংস শান দিচ্ছেন অস্ত্রে। কী করবেন দেবকী? কীভাবে রক্ষা করবেন যে আসছে তাকে।

বিমর্ষ দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেব। কারারক্ষীর নজর এড়িয়ে দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ করেন। কিন্তু কী করবেন কিছুই ভেবে উঠতে পারেন না। শেষমেশ আবার দৈববাণী হলো। এক অদৃশ্য

পুরুষকণ্ঠে ঘোষিত হলো, সদ্যজাত সন্তানকে গোকুলের নন্দালয়ে রেখে আসতে হবে। অর্থাৎ মা হয়েও দেবকী সন্তানের মুখ দেখতে পারবেন না বহুদিন। অন্তত যতদিন না কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু হয়। যে মায়ের সাতটি সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে তার পক্ষে সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য দেবকীকে এটা পারতেই হবে। নয়তো কংস বধ হবে না, পৃথিবীও বাঁচবে না।

অন্যদিকে নন্দের স্ত্রী যশোদা মায়ের স্নেহে বড়ো করে তুললেন কৃষ্ণকে। হাজারো খুনসুটি আর দুষ্টুমিতে ভরে গেল নন্দের ঘর। সারা

গোকুল আপন করে নিল কৃষ্ণকে। যেন তিনি শুধু যশোদার নন, নন্দের নন— সকলের! শিশু কৃষ্ণের মাখন চুরি করে খাওয়ার জন্য অতীষ্ট গোপবালারা। তারা যশোদার কাছে এসে নিত্য অভিযোগ করেন। মা যশোদা ছেলেকে বেঁধে রেখে শাস্তি দেন। কিন্তু তাঁকে বেঁধে রাখা কি অত সহজ। বাঁধন ছিঁড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। গোপবালাদের মাখন চুরি হয়ে যায়। তারা মা যশোদার কাছে এসে আবার অভিযোগ করেন। যশোদা ভেতরে গিয়ে দেখেন কৃষ্ণকে যেমন তিনি বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন তিনি তেমনই বাঁধা আছেন। হাসছেন মাকে দেখে। ওই হাসি দেখে যশোদা ভুলে যান ছেলেকে শাসন করার কথা।

মা ও ছেলের ভালোবাসায় ছেদ পড়ল একসময়। দেবকীর মতো যশোদার জীবনেও নেমে এল বিচ্ছেদ। কৃষ্ণকে যেতে হবে মথুরায়। কংসের মোকাবিলায়। যশোদা বিস্ময়ে প্রায় পাথর হয়ে গেলেন। ওইটুকু ছেলে কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? এমন আজব কথা কেউ কখনও শুনেছে! তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন না তার প্রিয় কান্‌হাকে। কিন্তু কৃষ্ণকে যে যেতেই হবে। এমনটাই বিধিনির্দেশ। সমগ্র গোকুল শোকে উন্মাদ হয়ে গেল। প্রিয় কৃষ্ণ গোকুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সেদিন গোকুলের আকাশ-বাতাস, পশুপাখি— এমনকী গাছের পাতাটি পর্যন্ত বিষণ্ণ। তাদের একটাই আর্তি, যেয়ো না কৃষ্ণ। গোকুল ছেড়ে যেয়ো না।

আর মা যশোদা? তিনি শেষপর্যন্ত শোককে অতিক্রম করেছেন। কান্‌হাই তাকে সেই শক্তি দিয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন কৃষ্ণকে মানুষের প্রয়োজন। সারা পৃথিবীর প্রয়োজন। তাকে মায়ার আঁচলে বেঁধে রাখলে চলবে না।

দেবকী ও যশোদার মতো মা না হলে কৃষ্ণের মতো সন্তান হয় না। ওঁরা ছিলেন বলেই কৃষ্ণ ধর্মযুদ্ধ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এ মর কইয়ো তারে গিয়া...

সন্দীপ চক্রবর্তী

এ পথের চলনটি বেশ মজার। যেতে যেতে বাঁক ফেরে। তারপর বাঁধা সড়ক তার জ্ঞানগম্যি হারিয়ে আবাঁধা কাঁচা রাস্তার ধুলোর সঙ্গে সই পাতিয়ে দিব্যি এগোয়। কে রাজপথ আর কে মেঠোপথ বোঝার উপায় থাকে না। মানুষগুলোও বেশ। গুমোর নেই, ঠ্যাকার নেই। অচেনা লোক দেখেও কাছে আসতে ডরায় না। এসেই দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'জয় গুরু!' এই এখানকার রীতি। চেনা অচেনা যার সঙ্গেই দেখা হোক, আগে গুরুস্মরণ।

নদীয়া মহাপ্রভুর জেলা। দোল-জন্মাষ্টমীতে এখানকার আশ্রমে-আখড়ায় বড়ো উৎসব হয়। আমিও তো এখানে এসে জুটেছি জন্মাষ্টমীর উৎসব দেখব বলে। তাই লোকটিকে ভালো করে দেখি। ছোটোখাটো চেহারা। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি হবে না। শান্তিপুরী ধুতি আর হাফ হাতা ফতুয়ায় মানিয়েছে চমৎকার। টেরিকাটা চুলের রাশ নেমেছে ঘাড়ের কাছে। চোখে টলটল করছে মানুষ দেখার আনন্দ। এসব দেখে মনে হতে পারে আমি বুঝি ওর অনেকদিনের চেনা। কথাটা অবিশ্যি মিথ্যেও নয়। চোখের চেনা না হই মনের চেনা তো বটেই। তাই আমিও কপালে হাত ঠেকিয়ে বললাম, 'জয় গুরু!'

'তা বাবু যাবেন কোন দিগরে?'

দিক ঠিক করে সাধারণত বেরোই না। ছুটিছাটায় যেদিকে মন টানে চলে যাই। তবে এবারে পকেটে একটা নেমন্তন্নের চিঠি আছে। বললাম, 'যাব রঘুনাথ মহন্তের আশ্রমে।'

'জন্মাষ্টমীর পুজো দেখতে যাচ্ছেন বুঝি! যান বাবু। মহন্ত আমাদের বড়ো ভালো লোক। চোখে কৃষ্ণ, গলায় কৃষ্ণ— সর্ব অঙ্গে কৃষ্ণ! বলবেন পথে সদানন্দ দাসের সঙ্গে দেখা হইছিল।'

'আপনার নাম বুঝি সদানন্দ?'

সদানন্দ লজ্জা পেল বোধহয়। মুখ নীচু করে বলল, 'এজ্ঞে সদাও বলতে পারেন। ওইটি ডাকনাম। ঘরে ওই নামেই ডাকে সবাই।'

হাসিটি পথে রেখে সদানন্দ চলে গেল। আমিও পা বাড়ালাম গন্তব্যের দিকে। সন্ধ্যে নামতে আর বেশি দেরি নেই। ছায়ার সর পড়েছে আকাশময়। রাস্তার ধারে আদিগন্ত ধানক্ষেতে এতক্ষণ যারা কাজ করছিলেন তারা পা দুটো সামনে ছড়িয়ে এখন মাঠের ওপর বসে আছেন। কেমন একটা উদার-উদাসীন ভাব। মাঝে মাঝে মনে ধন্দ লেগে যায়। এরা সবাই গৃহস্থ লোক। বাড়িতে বউ-বাচ্চা সবই আছে।

তাহলে কীসের এই উদাসীনতা? অমন কাঙালের মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ক'জন পারে! না, জানি না। এদের মনের আঙিনায় রাধাকৃষ্ণ বাস করেন বলেই বোধহয় মাটির আঙিনার আলপনা কখনও পুরনো হয় না।

অবশেষে পৌঁছনো গেল। বাঁখারির বেড়াটি দূর থেকেই নজরে পড়েছিল। কাছে যেতে টিনের সাইনবোর্ডটিও নজরে পড়ল। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউয়ের মন্দির এবং আশ্রম। সেবক শ্রী রঘুনাথ দাস।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে অনেকখানি বাগান। থোকায় থোকায় থলকমল ফুটে আছে। আর আছে বেল, টগর, কণকচাঁপা দু-একটা আম-কাঁঠালের গাছ। গন্ধে ভুরভুর চারপাশ। কৃষ্ণ নিজেই ফুল, নিজেই ফল। তবুও তার ফুলও চাই, ফলও চাই।

আশ্রমে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। বাগানে আবছায়া অন্ধকার। গাঁয়েগঞ্জে ঘোরা অভ্যেস আছে বলে আমার অসুবিধে হয় না। আন্দাজে আন্দাজে একসময় মন্দিরের সামনে চলে গেলাম। মন্দির দুটি। একটি রাধাকৃষ্ণের আর অন্যটি মহাপ্রভুর। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় দর্শন করে বেরিয়ে আসার সময় পিছন থেকে কেউ ডাকলেন, 'তুমি কে গা?'

দেখলাম এক বৃদ্ধা লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। নামধাম বললাম। আমি যে রঘুনাথ মহন্তের কাছে এসেছি তাও জানালাম। বৃদ্ধা একগাল হেসে বললেন, 'ও মা তুমিই সে! বাবাজী তো তোমার জন্য কখন থেকে অপিক্ষে করতেছেন। তা চলো তার কাছে।'

রঘুনাথ মহন্ত নিজের ঘরেই ছিলেন। ওর ঘরটি দোলমঞ্চের পিছনে। একটা বিশাল তমাল গাছের আড়ালে বলে বাগানের দিক থেকে এলে চোখে পড়ে না। আমাকে দেখে মহন্ত উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন। বোধহয় নাম করছিলেন। আগেও দেখেছি নাম করার সময় তিনি মৃদু শব্দে খঞ্জনী বাজান। এমনিতে তিনি সুগায়ক। ওর গলায় চণ্ডীদাসের পদ শুনলে চোখে জল এসে যায়। একবার শুনেছিলাম— রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। সেদিন রাধারানিকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। প্রেম গভীর না হলে কি বিরহ গভীর হয়? প্রিয়কে না পেয়ে কাঁদে তো সবাই। কিন্তু রাধারানি তো কৃষ্ণকে শুধু নিজের প্রিয় করে রাখেননি, জগতের কাছে শ্রেয় করে তুলেছেন। সেইজন্যেই বোধহয় রাধারানি আমাদের এত আপন। আমাদের ঘরের মেয়ে। প্রেমিকের প্রতি অভিমানে একলা ঘরে চুপ করে বসে থাকার সময় এ দেশের সব মেয়েই রাধারানি হয়ে যায়।

হাতের খঞ্জনীটি নামিয়ে রেখে রঘুনাথ মহন্ত বললেন, 'এসো ভাই। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। হাজার হোক, নতুন জায়গা তো।'

ওকে আশ্বস্ত করলাম। এই গ্রামে কখনও না এলেও নদীয়া আমার চেনা জায়গা। নবদ্বীপে নিতাই ঠাকুরের আশ্রমে অনেকবার গেছি। ওর ডাক সবসময় কানে লেগে থাকে। ইচ্ছে হয় চলে যাই। কিন্তু যাওয়া হয় না। ডাক যতক্ষণ না পাকা হয় কোথাও যাবার উপায় নেই।

পরের দিন জন্মাষ্টমী। পুজোআর্চায় আমার তেমন মন না থাকলেও রাধাকৃষ্ণের চিরকালীন ভাবটি আমাকে চুম্বকের মতো টেনে রাখল। মনে হলো এখান থেকে চলে গেলে নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে যাওয়া হবে। রাধাকৃষ্ণের ভাবে ভাবময় এ দেশের বাতাস। সেই বাতাসেই শ্বাস নিই। সেই বাতাসেই পাই বেঁচে থাকার আনন্দ। মিলন-বিরহের যে ভাব আমার অন্তর্লোককে সঞ্জীবিত করে রাখে তাকে কোনও কিছুর জন্যেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং যাওয়া হলো না।

বিকেলে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাওয়া গেল। মহন্ত বললেন, 'যাও। এখন একটু ঘুরে এসো। তবে ফিরতে দেরি করো না। সন্ধ্যেবেলায় ননীসেবা হবে। সে একটা দেখার জিনিস বটে।'

বেরোলাম। দূরে যাব না। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম আশ্রমের পিছন দিকে। হঠাৎ কানে এল গানের সুর। শব্দ অনুসরণ করে কাছে যেতে চোখে পড়ল একটা দিঘি। আর সেই দিঘির ঘাটে বসে একটি অল্পবয়েসি মেয়ে আপনমনে গান গাইছে। ভ্রমর কইয়ো তারে গিয়া/শ্রীকৃষ্ণ বিহনে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে ভ্রমর/কইয়ো তারে গিয়া।

মনে পড়ে গেল নরুনের কথা। তেরো বছর বয়েসের সেই কিশোর বাউল। কয়েক বছর আগে মৌরিপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে সে তো আমায় এই গানই শুনিয়েছিল। সেদিন শ্রীমতিকে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আজ যেন শ্রীমতিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কত বয়েস হবে মেয়েটির? বড়োজোর চব্বিশ-পঁচিশ। এই বয়েসে এমন গভীর বিষাদ ও কোথা থেকে পেল? এক জীবনে এতটা কি সম্ভব? নাকি, জন্ম-জন্মান্তরের বিরহে কাতর রাধারানি স্বয়ং এসে বসে আছেন এই দিঘির ঘাটে?

হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এই আনন্দের আঘাতে আমার মন টলোমলো। একবার ভাবলাম, যাই, ওকে ডাকি। পরক্ষণেই মনে হলো, না। মেয়েটির মনে যদি কাউকে গান শোনানোর ইচ্ছে থাকত তা হলে এই নির্জন ঘাটে এসে গাইত না। ও কাউকে শোনাতে চায় না। কিংবা যাকে শোনাতে চায় তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে আসেন এই দিঘির ধারে। মেয়েটি জানে তিনি কোথায়। আমি বাইরের লোক। তাকে অনুভব করতে পারি কিন্তু তার নাগাল পাব কী করে!

রাতে খাওয়ার সময় মহন্তকে মেয়েটির কথা বললাম। আজ মহন্তর উপবাস। যতক্ষণ না মা যশোদার সঙ্গে সদ্যজাত কৃষ্ণের মিলন হয় ততক্ষণ তিনি কিছু খাবেন না। কিন্তু আমি অতিথি। নারায়ণ। অতিথিসেবার তাগিদেই তিনি আমার পাশে বসেছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহন্ত বললেন, 'ওর নাম মাধুরী। বড়ো দুঃখী মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামী নেয় না। আজকাল কারোর সঙ্গে মেলামেশাও করে না। সারাদিন ঘাটে বসে থাকে। কখনও কখনও গান গায়। গলায় সুর আছে। আমি বলেছিলাম, একলা গান না গেয়ে আমার গোবিন্দকে তো শোনাতে পারিস। তাতে বলল, গোবিন্দকেই তো শোনাই ঠাকুর। না হলে যে আমায় নেয় না, যে আমায় কোনওদিন নেবে না— তার মুখ দিঘির জলে অমন ফোটে কী করে? গোবিন্দ ছাড়া কার এমন দয়া হবে গো ঠাকুর?'

সময় যেন থমকে গেল। মনে হলো মাধুরীকে রাধারানি ভেবে আমি কোনও ভুল করিনি। এ দেশের প্রতিটি মেয়ের মধ্যে আজও রাধারানি বাস করেন। পুরুষের আঘাত তাকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে। ঘাট থেকে তার আর ঘরে ফেরা হয় না।

ফিরে আসার দিনে শেষবারের মতো রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গেলাম। প্রণাম করার পর মনে হলো, কথাটা বলি। মানুষের সব খেলা আর খেলনার ভার যার হাতে তাকে কথাটা বলাই যায়। বললাম, অন্য কিছু নয়, তুমি শুধু এইটুকু দেখো, মাধুরী যেন ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথ খুঁজে পায়। না হলে ঘর আর ঘাট সব একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে। []

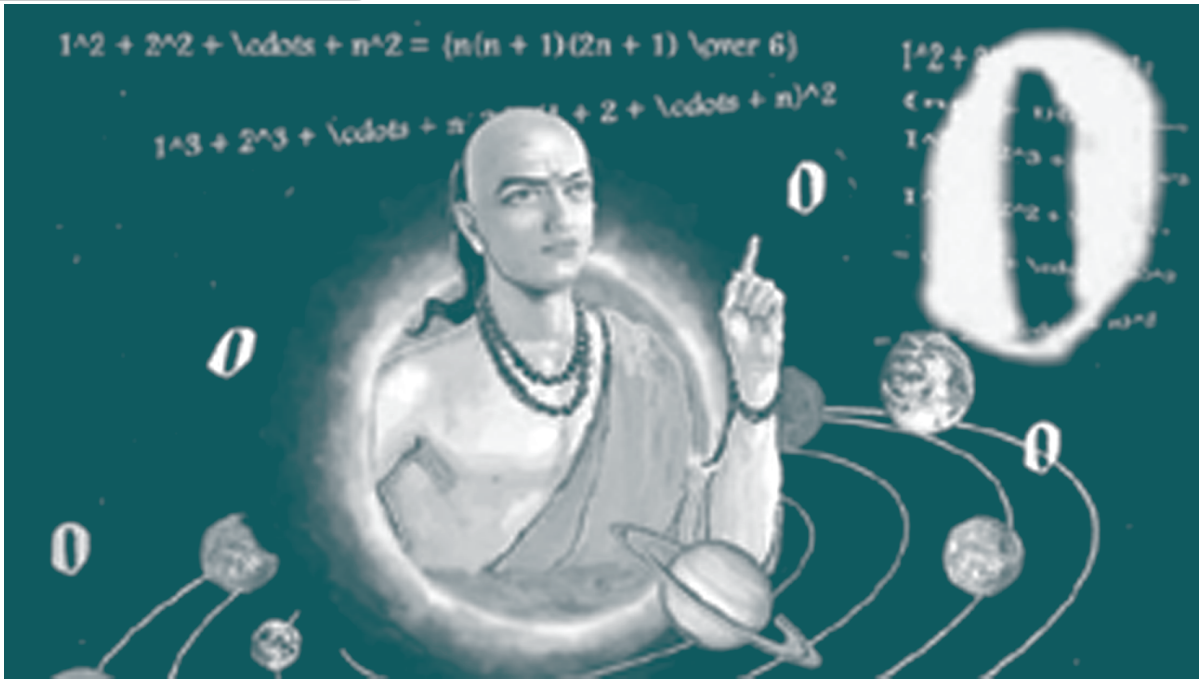

প্রাচীন ভারতের প্রতিভাকে উপেক্ষা করেছে আধুনিক বিশ্ব

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

ধর্ম রক্ষতিঃ রক্ষিতঃ
অহিংসা পরমো ধর্ম
ধর্ম হিংসা তথৈ বচঃ

দীর্ঘ সময় ধরে মুঘল শাসন ও পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসনকালে বিদেশিদের অত্যাচারে অখণ্ড ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি ও তার বৈজ্ঞানিক আধার সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়ার স্থান গুরুকুল প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে অধিকাংশ সনাতনী তাদের হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও তার বৈজ্ঞানিক আধার বা ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নয়।

১. হিন্দু ধর্মের ১০৮ সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ কেন?

হিন্দু ধর্মের দেবতাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র অন্যতম। ঋগ্বেদে এবং প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে—

(ক) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সূর্যের ব্যাসের ১০৮ গুণ।

(খ) পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হলো চন্দ্রের ব্যাসের ১০৮ গুণ।

তাই আমরা পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও সূর্যকে একই আকারের দেখতে পাই।

উপরিউক্ত (ক) এবং (খ)-এর কারণে আমাদের প্রার্থনার মন্ত্রের অধিকাংশ জপমালার সংখ্যা ১০৮ হয়ে থাকে।

২. বেদে সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :

যত্ ত্বা সূর্য স্বর্ভানু স্তমসাবিধ্যাদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ।। ঋগ্বেদ, ০৫.৪০.০৫

অর্থ : হে সূর্য যাকে (চাঁদ) তুমি তোমার নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করেছ, তাঁর (চাঁদের) দ্বারা যখন তুমি আচ্ছাদিত হও, তখন আকস্মিক অন্ধকারে পৃথিবী ভীত হয়।

৩. বেদে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ :

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, সূর্য পৃথিবী-সহ সৌরজগতের সমস্ত গ্রহাদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ধরে রেখেছে। এর জন্যই কেউই তার নিজস্ব কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায় না। এবং প্রত্যেকে সূর্যের সঙ্গে আকাশগঙ্গা ছায়াপথকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের এই গতিশীলতা ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিষয়ে ঋগ্বেদের ১। ৩৫। ২ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'সূর্য তার আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবী আদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রেখে, নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত রেখে এবং মাধ্যাকর্ষণ রূপ রথে চড়ে যেন সারা লোক লোকান্তরকে দেখতে দেখতে গমন করছে।'

৪. বেদে উল্লিখিত চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই :

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে চাঁদের কোনো আলো নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে পৃথিবীকে আলো প্রদান করে। ঠিক একই ধরনের কথা বলা হয়েছে ঋগ্বেদে ১। ৮৪। ১৫ নং মন্ত্রে। চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে পৃথিবীকে আলো প্রদান করে। পবিত্র ঋগ্বেদের ১০। ৮৫। ৯ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে সূর্য চন্দ্রকে নিজ আলো উপহার স্বরূপ প্রদান করে।

৫. বেদ অনুসারে গ্রহের সংখ্যা ৮টি :

আধুনিক বিজ্ঞানের মতো বেদে বর্ণিত গ্রহসংখ্যাও ৮টি। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিয়ন কর্তৃক চূড়ান্ত গ্রহতালিকা অনুযায়ী সৌর জগতে মোট গ্রহ হলো ৮টি। গ্রহসম্পর্কে ঋগ্বেদের ১০। ৫৫। ৩ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে 'হে দীপ্যমান তুমি ব্যপ্ত হয়ে আছে এই অবনীতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, পঞ্চ পদার্থে, সপ্তলোকে, সাত আলোকরশ্মিতে ও সকল ঋতুতে।' মন্ত্রে উল্লিখিত অবনী অর্থ হলো পৃথিবী এবং সপ্তলোক অর্থ হলো ৭টি গ্রহ অর্থাৎ পবিত্র বেদে পৃথিবী-সহ মোট ৮টি গ্রহের কথা বলা হয়েছে।

৬. হিন্দু মতে সৌরবছর :

আধুনিক সৌর বছর গণনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সৌর বছর গণনার পার্থক্য মাত্র ২৪ মিনিট। আধুনিক সৌর বছর গননা অনুযায়ী ১ বছর সমান ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। অপরদিকে বিখ্যাত আর্য গণিতবিদ আর্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের হিসাব অনুযায়ী এক বছর সমান হলো, ১৫৭৭৯১১৭৮০০/৪৩২০০০০= ৩৬৫.২৫৮৭৫ দিন।

৭. হনুমান চালীশাতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব :

অনেকেই জানেন যে হনুমান চালীসাতে একটি লাইনে বলা আছে 'যুগ সহস্র যোজন পর ভানু। লীল্যো তাই মধুর ফল জানু।' ১ যুগ = ১২০০০ বছর। ১ সহস্র = ১০০০। ১ যোজন = ৮ মাইল।

যুগ × সহস্র × যোজন = এক ভানু।

১২০০০ × ১০০০ × ৮ মাইল = ৯৬০০০০০০ মাইল। ১ মাইল = ১.৬ কিমি।

অর্থাৎ ৯৬০০০০০০ মাইল = ৯৬০০০০০০ × ১.৬ কিমি।

= ১৫৩৬০০০০০০ কিমি।

নাসা বলেছে এটাই পৃথিবী থেকে সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব।

৮. বেদে উল্লিখিত সূর্যের নিজ অক্ষের উপর আবর্তন ও পরিক্রমণ :

যজুর্বেদের ৩৩। ৪৩ নং মন্ত্রে লেখা আছে 'সূর্য তার গ্রহদের নিয়ে (ছিন্ন অংশ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় নিজ কক্ষপথে ও নিজের অক্ষে প্রদক্ষিণ করে।

৯. আয়ুর্বেদ ও শল্য বিজ্ঞানে হিন্দুর অবদান :

হাজার হাজার বছর আগে পাশ্চাত্যের ওষুধ আবিষ্কারের বহু পূর্বেই প্রায় ১০০০০০ ভেষজের কথা উল্লেখ করে গেছেন। মহর্ষি চরক তাঁর চরক সংহিতা গ্রন্থে। যার জন্য ভারত আজ আয়ুর্বেদের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।

মহর্ষি শ্রুশ্রুত প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর 'শুশ্রুত সংহিতা' বইতে লিখে গেছেন আমাদের শরীরে ৯০০ অস্থিসন্ধি বা লিগামেন্ট আছে এবং এই লিগামেন্ট ৪ প্রকারের হয়। এই বইতে তিনি শল্য চিকিৎসার কথা লিখে গেছেন। মহর্ষি শুশ্রুতকে শল্যচিকিৎসা বা সার্জারির জনক বলা হয়।

১০. গতিবিদ্যায় কণাদের অবদান :

কণাদ আইজ্যাক নিউটনের বহু পূর্বেই গতিবিদ্যার সূত্র আবিষ্কার করেন।

(বৈশেষিক সূত্র ৫ম অধ্যায় ১ম আহ্নিকঃ)

'সমযোগাভাবে গুরুত্বাত্ পতনম্।।' (বৈশেষিক সূত্র ৫। ১। ৭)

অর্থাৎ সমযোগের অভাবে (বহিরাগত বা বাহ্যিক শক্তির অভাবে) কোনো বস্তু তার গুরুত্ব (ভার)-এর জন্য পতিত হয়।

নিউটনের প্রথম সূত্র : কোনো বাহ্যিক বল না ক্রিয়া করলে কোনো গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকবে।

'নোদনবিশেষাভাবাত্নোদ্রধ্বং ন তিয়ঞ্জ মনম' (বৈশেষিক ৫। ১। ৮)

কোনো বস্তুর উপর বাহ্যিক বল (নোদন)

প্রয়োগ না হলে বস্তুটি উর্ধ্বদিকে, পশ্চাৎদিকে বা তির্যকদিকে ধাবিত হবে না এবং বস্তুটি স্থির থাকবে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভর m, ত্বরণ a এবং প্রযুক্ত বল (F) হলে, F = ma

'প্রয়ত্নবিশেষান্নোদনবিশেষঃ।।' (বৈশেষিক সূত্র ৫। ১। ৯)

অর্থাৎ বিশেষ বলে কাজ হলে (প্রযত্নবিশেষ) তার বিপরীত কাজও (নোদনবিশেষ) ঘটিতে হইবে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র : ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান ও বিপরীত।

'নোদনবিশেষঃদুদাসনাবিশেষ' (বৈশেষিক ৫। ১। ১০)

বস্তুর কিছু নির্দিষ্ট বা বিশেষ উর্ধ্বগতি (উদাসনা) হয় কিছু বিশেষ ক্রিয়ার কারণে (বিশেষঃ নোদন)

১১. টোনোস্কোপে ওম্ শব্দের আকৃতির সঙ্গে শ্রীযন্ত্রের মিল :

শব্দতরঙ্গকে যন্ত্রের মাধ্যমে আকারদান করা যায়। এই যন্ত্রকে টোনোস্কোপ বলা হয়।

প্রাচীন ভারতে ঋষিরা ধ্যানের সাহায্যে শ্রীযন্ত্র বা ওমমণ্ডলকে অঙ্কন করেছিলেন কল্পনার মাধ্যমে।

বর্তমানে টোনোস্কোপ যন্ত্রে 'ওম' শব্দকে প্রতিফলিত করানোর পর সেই শব্দতরঙ্গের আকার শ্রীযন্ত্রের মতোই লক্ষ্য করা গেছে। প্রমাণ এখানেই লক্ষ্য করা যায়।

১২. শূন্য (Zero) এবং পাই (π)-এর মান অবিষ্কার :

প্রাচীন ভারতীয় সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি আর্যভট্টিয়াম নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে π এর মান নির্ধারণ করেছিলেন। আর্কিমিডিসের বহু পূর্বেই।

১৩. বেদে পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণের প্রমাণ :

ঋগ্বেদের ১০। ২২। ১৪ নং মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে পৃথিবী তার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত বস্তুকে নিয়ে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করে। কোপারনিকাসের বহু পূর্বেই ঋগ্বেদে এই কথার উল্লেখ আছে।

১৪. পবিত্র বেদে চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের উল্লেখ :

ঋগ্বেদের ১০। ১৮৯। ১ নং মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার সঙ্গে তার জন্মদাতা সূর্যকেও (জ্বলন্ত) অনুসরণ করে প্রদক্ষিণ করে।

১৫. আর্যভট্টিয়াম গ্রন্থের বিজ্ঞান :

আর্যভট্ট তাঁর আর্যভট্টিয়াম নামক গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রহের ব্যাস, তাদের কক্ষপথ, সেইসব গ্রহের ঘূর্ণন সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র দিয়েছিলেন। তিনি এই সমস্ত সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণের সময় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সঠিক কারণ বলেছিলেন।

১৬. প্রাচীন ভারতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আলোচনা :

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের ১৩ নং শ্লোকের ৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে কোনো বস্তুকে (ভার), আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মাটিতে নেমে আসে। এই শ্লোকটি ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গাণিতিক রূপও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর কৃতিত্ব আইজ্যাক নিউটনের ১০০০ বছর আগে ভারতীয়রা অর্জন করলেও তার কৃতিত্ব যায় নিউটনের কাছে।

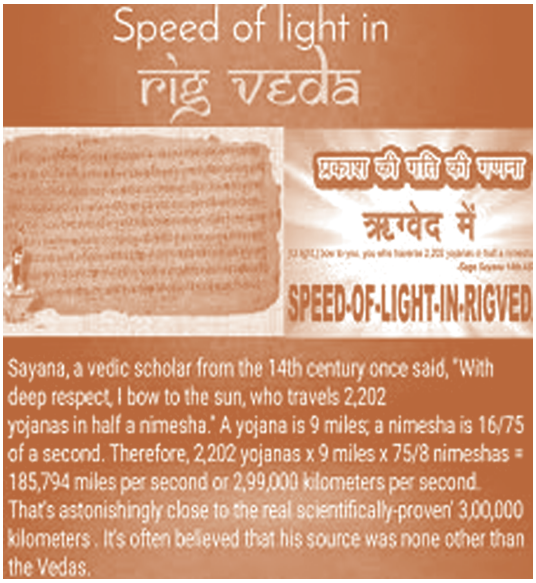

১৭. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র :

৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৌধোয়ানা তার সুলবা সূত্র গ্রন্থে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের (সমকোণী) সূত্র লেখেন। যদিও এই সূত্রের সার যজুর্বেদে হাজার বছর পূর্বেই উল্লিখিত ছিল।

'দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষ্ণায় রজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্যগ্
মানী চ য়ত পৃথগ্ ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি"

একে বর্তমানে

$C^2 = A^2 + B^2$ এই সূত্র অনুসারে জানা যায়।

১৮. সূর্যকে সমস্ত গ্রহ পরিক্রমণ করে বেদে তার প্রমাণ :

'পঞ্চারচে পরিবর্তমানে তস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।' (ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ১৩)

পৃথিবী-সহ সমস্ত গ্রহ নিজ অক্ষের চারিদিকে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে।

১৯. রামধনু এবং লেন্সের বিজ্ঞান :

শ্লোক :

'কায়াভ্রাপতলাস্ফটিকন্তরিতোপালাব্ধেহ'।।

[নয়া দর্শনম অধ্যায়ঃ ৩, সূত্রম ৪৬,। কনাদ (৮০০ খ্রি.পূ.)]

অর্থ : যে সমস্ত বস্তুকে খালিচোখে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেগুলি কাঁচের তৈরি লেন্স এবং কেলাস দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

শ্লোক :

'সূর্যস্য বিবিধবর্ণ পবনেন বিঘায়েত করঃ স ভ্রে।
ভীয়তি ধনুহঃ সমস্থানহ য়ে দৃশ্যন্তে তদিনদ্রধনুহ।।'

(বৃহৎ সংহিতা, শ্লোক-৩৫, বরাহমিহির (খ্রিস্টীয় ৬ শতক))

সূর্যের রশ্মির মিশ্রিত রং মেঘময় আকাশে বাতাসের দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে একটি ধনুকের মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে বলে রামধনু।

২০. হিন্দু রীতিতে কেন তামা ব্যবহার করা হয় ?

তামা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তামার পাত্রে জল রাখার কথা উল্লেখ আছে।

২১. বেদে উল্লিখিত সূর্যের বিস্তৃত রূপ :

ছান্দোগ্যউপনিষদে লেখা আছে সূর্যকে নিকট হতে দেখলে মনে হয় এটি যেন মৌমাছির মধু কোঠরীর বা মধুঘরের মতো ষড়ভুজাকৃতি অংশ দিয়ে সজ্জিত জ্বলন্ত আগুনের গোলা। NASA বর্তমানে স্বীকার করেছে সূর্যকে কাছ থেকে দেখলে Honeycomb-এর মতো দেখায়।

২২. হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজানো উচিত কেন ?

আগমঃ শাস্ত্র অনুসারে ঘণ্টাধ্বনি অশুভ শক্তিকে সর্বদাই দূরে রাখতে সাহায্য করে।

ঘণ্টাধ্বনিকে মনে করা হয় এটি মৌলিক ধ্বনিগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে।

ঘণ্টাধ্বনি মস্তিষ্কের বাম এবং ডানদিকের অংশের মধ্যে একতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যখনই ঘণ্টাধ্বনি হয় এটা একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সৃষ্টি করে যেটা প্রায় ৭ সেকেন্ডের মতো প্রতিধ্বনি আকারে স্থায়ী হয়। এই প্রতিধ্বনির সময় আমাদের দেহের ৭ চক্র (সপ্তকুণ্ডলিনী) জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

২৩. অগস্ত্যমুনির আবিষ্কার :

আমরা জানি অ্যালেসান্দ্রো ভোল্টা তড়িৎকোষ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অগস্ত্যমুনি প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে এই সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে গেছেন। জলের তড়িৎবিশ্লেষণ সম্পর্কেও তিনিই ধারণা দেন।

ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র : বিখ্যাত হিন্দু গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুতসিদ্ধান্তে অন্তঃবৃত্তস্থ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিখ্যাত সূত্র পাওয়া যায়। ব্রহ্মগুপ্ত এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এই সূত্র এখনও সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়।

সূত্রটি হলো, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

$= \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$

তিনিই প্রথম বলেন, দুটি পজিটিভ নাম্বারের ভাগফল এবং দুটো নেগেটিভ নাম্বরের ভাগফল উভয়ই পজিটিভ। 0 কে পজিটিভ বা নেগেটিভ দিয়ে ভাগ কলে 0 ই পাওয়া যাবে।

● **আলোর গতি সম্পর্কে বিজ্ঞান :** বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত সায়নঃ ঋগ্বেদের ১.৫০.৪ মন্ত্রের ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন যে সূর্যকে সম্মান জানিয়ে সূর্য-এর আলো ২২০২ যোজন পথ অতিক্রম করে অর্ধেক নিমেষে। যার বর্তমান মান হলো— ১৮৫,০১৬.৩৯৭ মাইল/সেকেন্ড। বিজ্ঞান প্রমাণিত আধুনিক মান হলো ১৮৬,২৮২.৩৯৭ মাইল/সেকেন্ড। যা বর্তমানে প্রমাণিত মানের কাছাকাছি। সায়নঃ এই ধারাভাষ্যটি দিয়েছিলে ১৬ শতকে (খ্রিস্টীয়)। ▯

ধোলাভিরায় সিন্ধু সভ্যতার নতুন দিগন্ত

কৌশিক রায়

আমরা সিন্ধু সভ্যতার মূল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনবিশিষ্ট স্থানগুলি বলতে বর্তমানে পাকিস্তানের লারকানা আর পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, বালুচিস্তানের সুৎকাজেন-দোর আর চান্হু-দাড়ো-কে বুঝে থাকি। এছাড়াও, রাজস্থানের কালিবাঙ্গান, গুজরাটের রোপার এবং লোথাল ও মেহেরগড় থেকে, আসিরীয়, গ্রীক ও মেসোপটেমিয় সভ্যতার মতোই উন্নত মানের নগর পরিকল্পনাযুক্ত সিন্ধু সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে। তবে, গুজরাটের কচ্ছ জেলাতে ভাচাউ তালুকের অন্তর্গত খাদিরবেত মৌজাতে ধোলাভিরা নামক যে অঞ্চলটি আছে— সেখানেও আকস্মিকভাবেই উৎখনন করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিকে। স্থানীয় মানুষদের কাছে 'কোটাডা টিম্বা' নামে পরিচিত, ত্রিকোণাকার অঞ্চলে আনুমানিক ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বহিঃশত্রুর বারংবার আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত ধোলাভিরার বাসিন্দারা, সম্ভবত ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই জনবসতি পরিত্যাগ করেন। অষ্টম বৃহত্তম হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে ১৯৬৮ সালে ধোলাভিরার উৎখনন করেন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর তদানীন্তন প্রধান— জেপি যোশী।

সম্প্রতি ২০২১ সালের ২৭ জুলাই ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যমূলক স্থানের গৌরবময় তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার নবদিগন্ত হয়ে ওঠা ধোলাভিরা। পুরাতাত্ত্বিক রবীন্দ্র সিংহ বিশ্ত-এর তত্ত্বাবধানে ৭টি পর্যায়ে গড়ে ওঠা ধোলাভিরা জনপদের উৎখনন নতুন করে শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর মতো তো বটেই, সুমেরীয় আর মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্গত ঊক, এরিডু, লাগাকা, নিনেভে নগরীগুলির মতোই পোড়ামাটির অট্টালিকা, পাকা নর্দমা আর বাঁধানো ও চওড়া রাস্তা ছিল এই ধোলাভিরাতে। এখান থেকেও পাওয়া গেছে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার তৈরি গয়না, খেলনা-পুতুল, বাসনপত্র এবং ব্রোঞ্জের বাসনপত্র। এছাড়াও, কিছু সোনা এবং রুপোর গয়নাও আবিষ্কৃত হয়েছে ধোলাভিরা থেকে। পুরাতাত্ত্বিকরা অনুমান করছেন— দক্ষিণ গুজরাট, সিন্ধু প্রদেশ, পঞ্জাব এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন (ফিনিসিয়া)-এর মতো রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল ধোলাভীরার মাধ্যমে। শহরটির মাঝখানে ছিল একটি বড়ো দুর্গ। শহরটি মূল নগরী ও মফঃস্বল এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্র এথেন্স-এর 'আগোরা'র মতো চারদিক খোলা, জনসমাগম ও রাজনৈতিক সভার জন্য নির্দিষ্ট স্থানও দেখা যায় ধোলাভীরাতে। পুরো এলাকাটাই ছিল দুর্গপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক শৈথিল্যের জন্য সেই সুরক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশই ভেঙে পড়তে শুরু করে।

এই এলাকার বহু বাড়ি কিন্তু গ্র্যানাইট এবং বেলেপাথর দিয়েও নির্মিত হয়েছিল। 'মানসার' ও 'মানহার' নামে দুটি খাল, ধোলাভিরার দুদিকে অবস্থিত। এই খালদুটিও পাথর দিয়ে বানানো। বৃষ্টির ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎসের জল সঞ্চয়ের জন্য, হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি জলাধার বানানো হয়েছিল ধোলাভিরাতে। এরকম দুটি জলাধারের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। আসলে, মরু অঞ্চলের নির্জলা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এই ধরনের জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে জল সংগ্রহ করা হতো কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য। মনে হয় এরকম প্রায় ২০টির মতো জলাধার ছিল ধোলাভিরাতে। পাথরের এই জলাধারগুলির গভীরতা হতো প্রায় ২৩ ফিটের মতো। এগুলি দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় ২৫৯ ফিট। হরপ্পার মতো একটি গণ-স্নানাগারও পাওয়া গেছে ধোলাভিরাতে। প্রায় ২৪১ ফিট গভীর, বহু ধাপযুক্ত একটি ইঁদারার ভগ্নাবশেষও পাওয়া গেছে ধোলাভিরা থেকে।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর মতো, ধোলাভিরা থেকেও বিভিন্ন প্রাণীর ছবিযুক্ত, ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত টেরাকোটা ও ব্রোঞ্জের শিলমোহর পাওয়া গেছে ধোলাভিরা থেকে। ধোলাভিরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি গোলাকার পাথর দিয়ে বাঁধানো ক্ষেত্র। সম্ভবত মৃতদেহের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। এখানে ১০টি কাদামাটির ইঁট দিয়ে বানানো দেওয়াল পাওয়া গেছে। গোরুর গাড়ির চাকার আকারে দেওয়ালগুলি বানানো হয়েছিল। জায়গাটি থেকে বেলে পাথরের তৈরি একটি পুরুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। অবশ্য, কোনও নরকংকাল এই সমাধিক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায়নি। অবশ্য পোড়া মাটির তৈরি শিলমোহর, আংটি, পুঁতির মালা মিলেছে এই সমাধিক্ষেত্রটি থেকে। তামার তার আর স্টিয়াটাইট ধাতুর তৈরি পুঁতি দিয়ে বানানো একটি কণ্ঠহারও পাওয়া গেছে ধোলাভিরা থেকে। ধোলাভিরাতে কতগুলি পাথরের তৈরি, অর্ধগোলাকৃতি ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ঘরগুলোর সঙ্গে সোমপুর, পাহাড়পুর ও উদ্দণ্ডপুরা মহাবিহারগুলির বৌদ্ধ সংঘারামগুলির গঠনগত সাদৃশ্য আছে। এই ধরনের অর্ধগোলাকৃতি কক্ষের নির্মাণশৈলীর কথা, 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' ও 'সুল্বা-সূত্র' নামক গ্রন্থদুটিতে আছে। এছাড়াও ধোলাভীরা থেকে পাওয়া গেছে লাল ও কালো রঙয়ের মাটির তৈজসপত্র এবং প্রায় ১০ ফিট লম্বা, সিন্ধু লিপিযুক্ত একটি দিক্‌নির্দেশক লিপিফলক। এছাড়া কিছু তামা ও ব্রোঞ্জের ফলকের ওপরও এই ধরনের রহস্যময় লিপির হদিশ পাওয়া গেছে ধোলাভীরাতে। একটা বড়ো মাপের ব্রোঞ্জের তৈরি হাতুড়ি ও ছেনি, বাটালি প্রমাণ করে দেয়— ধোলাভীরাতে কারিগর ও স্থপতিদের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি ছিল। এছাড়া এই এলাকা থেকে মিলেছে পোড়া মাটির তৈরি উট, পানপাত্র, ডিশ রাখার স্ট্যান্ড ও পাথরের তৈরি হামানদিস্তা। ▫

স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিস্টদের দেশভক্তির নাটক

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘ, সমিতি এমনকী সাধারণ মানুষেরাও স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য জাতীয় পতাকা নিজগৃহে উত্তোলন করেন বা এবারেও করেছেন। তবে শুধু যে এবারই পতাকা উত্তোলন হলো তা নয়। প্রতি বছরই তা হয়ে থাকে। তবে এবারে যে তফাৎটা চোখে পড়লো তা হলো সিপিএম দলের পক্ষ থেকে দেশের মধ্যে তাদের প্রতিটি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। এ যেন 'ঠ্যালায় পড়ে বিড়াল গাছে চড়ার' মতো। সেই পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে ঘটে গেল বিপত্তি। সিপিএমের সদর দপ্তরে বিমান বসু এদিন উলটো করে পতাকা উত্তোলন করলেন। এতে অবশ্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ 'অনুশীলন' বলে বাংলা অভিধানে একটি শব্দ আছে। সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। বিমানবাবুরা ৭৪ বছরের মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুশীলন কোনোদিনই করেননি। অনুশীলন করেননি বলেই এবারে সেই কাজে তাঁদের মুখ পুড়ল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবারেই প্রথম সিপিএমের কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা লাল পতাকার পাশে তারা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিল্লির এ কে গোপালন ভবন থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-সহ গোটা দেশের সমস্ত দপ্তরে উত্তোলন করলো জাতীয় পতাকা। কয়েক বছর আগে এরাজ্যে বামেদের পক্ষে দীর্ঘ ৪-৫ কিমি লম্বা মানবশৃঙ্খল করে শপথবাক্য পাঠের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হতো। এরপর গত বছর দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যৌথভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচি নিয়েছিল বাম-কংগ্রেস। কিন্তু এবার জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিয়ে সেই সমস্ত কর্মসূচির বদলে দলীয় দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার কর্মসূচি তাঁরা পালন করলেন।

দেশভাগের আগে থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রভাব সারাদেশে বিরাজ করত। কিন্তু তারা তাদের সেই প্রভাবের সুযোগ না নিয়ে এমন কতকগুলো কাজ করেছিল যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে।

পৃষ্ঠপোষক ও হিন্দুদের সর্বনাশকারী কমিউনিস্ট দল পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন হওয়া মাত্র ভারতভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার

দীর্ঘ ৭৪ বছর ধরে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশি দর্শন দেশবাসীকে গিলাতে চেয়েছে কমিউনিস্টরা। কিন্তু দেশের জনগণেশ তাদের পদাঘাতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে এদেশে তাদের প্রয়োজন নেই।

ফ ঃ ৫

করে নিয়ে সোল্লাসে ঘোষণা করল— 'The Pakistan is a just, Progressive and national demand.' আর এই দলের চেলা-চামুণ্ডারা মুসলিম লিগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাস্তাঘাটে জিগির দিতে থাকে— 'পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।'

অথচ কমিউনিস্টদের প্রাক্তন নেতা প্রয়াত জ্যোতি বসু একসময় বলেছিলেন— 'আমাদের পার্টি সে সময় দেশ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং নিজস্ব সীমিত শক্তি নিয়েও কংগ্রেস-লিগ ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য লাগাতার অভিযান চালিয়ে গেছে।' তিনি আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশ বিভাগ চাননি। এমনকী কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের একাংশও দেশ-বিভাগের বিরোধী ছিলেন।'

তাই যদি হবে তাহলে— 'মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার', 'বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাঙ্গলা' তাদের এসব স্লোগানের অর্থ কি? আবার যে সুরাবর্দি মন্ত্রীসভার ক্রিয়াকলাপে হিন্দু-মুসলমানে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটে গেল, তার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতেও জ্যোতিবাবুদের সাহসে কুলায়নি। স্বাধীন বাঙ্গলার বেনামে 'পাকিস্তানি বাঙ্গলা' বানাবার কারসাজিতেও কমিউনিস্টদের সমর্থন ছিল। কিন্তু যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্দোলনে তা ভেস্তে গেল তখন বাঙ্গলা ভাগের পক্ষে ভোট দিয়ে দেন আর চ্যালাদের 'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? —শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' বলে চোঙা ফুঁকতে লাগিয়ে দিলেন। কমিউনিস্টরা শুধু দ্বিচারিতাতে নয়, ত্রিচারিতাতেও বিশ্বাসী।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে এরা বিয়াল্লিশের আন্দোলনে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পর ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের সময় দেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছে। এরাজ্যে ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে তাদের ক্যাডারের হাতে কত যে হিন্দু মরেছে, হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছে, হিন্দুদের সংসার ধ্বংস হয়েছে তার হিসেব করা কঠিন। ১৯৬৯ সালে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি দিয়ে শুরু করে কাশীপুর, বরানগর, মরিচঝাঁপি,বিজনসেতু ছোটো আঙারিয়া, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাসন্তী, নেতাই, দেগঙ্গা এবং আরও বহুস্থান বাম নৃশংসতার সাক্ষী। দিল্লির জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনামের সন্ত্রাসবাদীরা ভারতকে যখন টুকরো করে, কাশ্মীর, মণিপুরের আজাদির জন্য আল্লার কাছে শপথ নিচ্ছিল তখন সীতারাম ইয়েচুরিদের সেখানে উপস্থিতি এবং সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন তাদের দলের নৌকার তলায় শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। যার জন্যে ২০১৯-এর নির্বাচনে জনগণের দেওয়া কুলোর বাতাসে সব কমিউনিস্ট উড়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে দু'এক টুকরো যা এরাজ্যে পড়েছিল— ২০২১-এর নির্বাচনে মোদী-মমতার ঝাড়ুতে সব ফরসা।

নেতাজীর প্রতি তারা যে কী অপরিসীম ঘৃণা ছড়িয়েছে তা শুনলে ঘৃণায় ওদের নাম মুখে আনতেও লজ্জা করে। নেতাজী যখন আজাদহিন্দ ফৌজ নিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করছেন তখন কমিউনিস্টরা যা বলেছিল তা দেখে নেওয়া যাক। তারা তাদের মুখপত্র 'পিপলস ওয়ারে' লিখেছে— 'বিশ্বাসঘাতক বোস কোনোদিন বাঙ্গলার সোনার মাটি স্পর্শ করতে পারবে না। ...আগস্টের ৯ তারিখ উদ্‌যাপন করার অর্থই হলো পঞ্চমবাহিনীকে উৎসাহ দেওয়া।' পিসি যোশি লিখেছেন--- 'বোস ভারতের স্বাধীনতার এক নম্বর বিশ্বাসঘাতক। তিনি তোজোর আশীর্বাদ নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে স্বাধীনতা চান।' 'বোস এখন জাপানি ফ্যাসিওদের ছুটন্ত কুকুর, তিনি ফ্রান্সের প্যাটেল, নরওয়ের কুইসলিং, চীনের ওয়াংচিয়াংওয়েই-এর মতো বিশ্বাসঘাতক।' তাছাড়া পিপলস ওয়ারের বহু সংখ্যায় নেতাজী সম্পর্কে তারা কুৎসিত কার্টুন এঁকেছে।

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টরা ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধেও তারা ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শোনা যায় এরা সেই সময় পাকিস্তানি দূতাবাসে ভারতের বেশকিছু গোপন সংবাদ প্রদান করেছে। ১৯৭১ সালে পুনরায় পাক-ভারত যুদ্ধে বাংলাদেশ যেন স্বাধীনতা না পায় তার বিরোধিতা করেছে এবং পাকিস্তানের কলকাতাস্থিত উপ-দূতাবাসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখেছিল। এ সমস্ত কারণে কমিউনিস্টদের বিপদ দিনদিন ঘনিয়ে আসছে। তাইতো সূর্যকান্ত মিশ্ররা এখন কেরলে রামনাম করা এবং রামসপ্তাহ পালন শুরু করেছে। বিভিন্ন কারণে এদের মধ্যে দেশদ্রোহী তকমা এমনভাবে সেঁটে গেছে যে তা মুছে ফেলার জন্য এখন তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ওরা এবারের স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পাপমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ওদের ভণ্ডামি কি বন্ধ হবে তাতে? যেমন, কমিউনিস্টরা বলেন, তারা ধর্ম মানেন না। বেশ, ভালো কথা। তাহলে ধর্ম না মেনে হিন্দু কমিউনিস্ট বিকাশ ভট্টাচার্য রাস্তায় ক্যামেরাম্যানের সামনে গোমাংস ভক্ষণ করেন। কিন্তু মুসলমান কমিউনিস্ট মহম্মদ সেলিম ধর্ম মেনে শূকরের মাংস খান না। কেন? আসল কথা এরা সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। এখন এই সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত কমিউনিস্টকে প্রথমে বেশি করে গোমুত্র পান করতে হবে। তারপর সর্বাঙ্গে গোময় মেখে গঙ্গাস্নান করে ভারতমাতার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে। তারপর জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বন্দেমাতরম্ এবং ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি দিতে হবে। তবেই তাদের পাপমুক্তি হলেও হতে পারে। নচেৎ নয়।

দীর্ঘ ৭৪ বছর ধরে যারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক শ্রেণীর দানবীয় শক্তিকে মদত দিয়ে এবং জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশি দর্শন দেশবাসীকে গিলাতে চেয়েছে, দেশের জনগণেশ তাদেরকে পদাঘাতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে এদেশে তাদের প্রয়োজন নেই। তাই তারা দিশেহারা হয়ে দেশবাসীর কাছে সবচেয়ে বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করার চেষ্টা করলেন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ▯

অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই শুকদেব থাপারকে হত্যা করেছিল ইংরেজরা

২৩ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে লাহোর জেলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় ২৩ বছরের শুকদেবকে। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরও শহিদ শুকদেব থাপারের স্মৃতিকে অমর করে রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়েছে মাত্র।

ডাঃ আর এন দাস

মনীষীরা বলেন, ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া জাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছিলেন, তাঁদের আমরা ভুলতে বসেছি। তাই তাঁদেরই একজনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব আজ।

অক্টাভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যা ব্রিটিশের তাঁবেদার হয়েই অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ছিল নরম আর গরমপন্থী দুই দল। নেহরু-গান্ধীরা প্রথম দলে আর দ্বিতীয় দলে ছিল 'লাল-বাল-পাল' মানে উত্তরভারতের পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়, পশ্চিমের বাল গঙ্গাধর তিলক যাকে ইংরেজরা বলত, 'ভারতের অশান্তির জনক' এবং পূর্বের প্রতিনিধি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী, 'বিপ্লবী চিন্তাধারার জনক', বিপিনচন্দ্র পাল। যথার্থ দেশভক্তরা ক্রমশই কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করছিল। পঞ্জাবে লালাজীকে অনুসরণকারী ভগতসিংহ, শুকদেব থাপার ও শিবরাম রাজগুরুকে দেশভক্তির অপরাধে ব্রিটিশ লাহোর জেলে ২৩ মার্চ, ১৯৩১ সালে একসঙ্গে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

শুকদেবের জন্ম হয় ১৫ মে, ১৯০৭ সালে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ন'ঘরা গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। পিতা রামলাল থাপার ও মা ছিলেন রাল্লী দেবী। মাত্র তিন বছর বয়সেই পিতার স্বর্গবাস হলে, স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যাঠামশাই অচিন্ত্যরামের উপর পরিবার প্রতিপালনের ভার পড়ে। জন্মের পর তাঁর পরিবার লায়ালপুরে আসেন। লায়ালপুরেই শুকদেবের দাদুর দোকান ছিল। ব্যবসার সূত্রে বাবা যখন লায়ালপুরে আসতেন, ভগতসিংহও সঙ্গী হতেন। ভগতকে শুকদেবের দাদুর দোকানে বসিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন তিনি। সেখানে শুকদেবের

The Tribune.

LAHORE, WEDNESDAY, MARCH 24, 1931

BHAGAT SINGH, RAJGURU AND SUKHDEV EXECUTED.

NO "LAST INTERVIEW" WITH RELATIONS.

Shouts Emerge From Jail.

DEAD BODIES SECRETLY DISPOSED OF

Removed to Distant Place.

Thick Veil of Secrecy.

Optical Instruments

সঙ্গে ভগতের সাক্ষাৎ সখ্যে পরিণত হয়। সারাজীবন তাঁরা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। একই দিনে মরণের পারেও পাড়ি দেন।

বাল্যকালেই শুকদেব অত্যাচারী ব্রিটিশের অন্যায় শোষণ-পীড়নের সাক্ষী হয়েছিলেন। একবার স্কুলে ইংরেজ পরিদর্শককে অভিবাদন করতে তিনি অস্বীকার করেন। সেজন্য তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এভাবেই তিনি বাল্যকালে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠেন।

১৯২২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে লাহোরে লালা লাজপত রায়ের পরিচালিত 'ন্যাশনাল কলেজে' ভর্তি হন। এখানে পুনরায় পুরনো সঙ্গী ভগত সিংহ ও যশপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই মহাবিদ্যালয় তখন ছিল সমস্ত দেশভক্তদের পীঠস্থান। কলেজের ক্যান্টিনে বসে তাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জাল বুনতেন। এখানেই ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয় 'নও জোওয়ান ভারতসভা'র। প্রোফেসর জয়চাঁদ বিদ্যালঙ্কার এবং লালা লাজপৎ রায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁরা প্রাচীন ভারতের তথা বিশ্বের প্রতিটি দেশের ইতিহাস চর্চায় মেতে থাকতেন। তখন পঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় ছিলেন তরুণ বিপ্লবীদের দীক্ষাগুরু। সহিংস বিপ্লবের ধারণা তাঁরা সেখান থেকেই পেতেন। সেদিন ভারতবর্ষ কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ ভূখণ্ড ছিল না বরং ছিল জাগ্রত এক দেশমাতৃকা!

একবার দলিত বালকদের স্কুলে পড়ার অধিকার নেই জেনে, শুকদেব নিজেই দলিতদের বস্তিতে গিয়ে পড়াতে শুরু করেন। এতেই সাম্যবাদী শুকদেবের চরিত্রে সমদর্শীর ভূমিকা প্রকাশ পায়। তখনকার সব থেকে চর্চিত দেশভক্ত পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গেও অচিরেই তিনি পরিচিত হন। 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের' সৃষ্টিকর্তা ছিলেন তাঁরাই।

শুকদেবের প্রখর বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁকে এইচএসআরএ-র পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যসচিব করা হয়। পরে তিনি সম্পূর্ণ উত্তর ভারতের সাংগঠনিক দায়িত্ব পান। নতুন সদস্য-সংগ্রহ অভিযান ও তাদের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট কাজের ভার দিয়ে তিনি নিরন্তর দেশমাতৃকার কাজে নিজেকে সঁপে দিতেন। কিশোর শুকদেব লালাজীর ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। শুধু দেশের স্বাধীনতাই নয় দেশকে সমাজবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নও দেখতেন। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতাহীন উন্মুক্ত এক সভ্য সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাল্যকালেই!

দেশে তখন রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। ১৯১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার এই আইন পাশ করে। এই আইনের দ্বারা যে কোনো ভারতীয়কে বিনা ওয়ারেন্টেই গ্রেপ্তার করা যেত। কংগ্রেস নেতা কানাহাইয়া লাল ও মুহাম্মদ বসির, ১২ এপ্রিল, ১৯১৯-তে হরতালের ডাক দেন। স্বতঃস্ফূর্ত অসহযোগ আন্দোলনে অমৃতসর-সহ পুরো পঞ্জাব বন্ধ হয়ে গেছিল। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার, মাইলস ইরভিং-এর বাড়ি ঘেরাও করে বিশাল জনতা।

১ বৈশাখ, ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগে বিপ্লবী ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সাইফুদ্দিন কিচলুর ডাকা বিশাল শিখ সমাবেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। অভিশপ্ত দিনটা ছিল ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯। জালিয়ানওয়ালাবাগের তিন দিক বন্ধ ছিল। বাইরে বেরুনোর একমাত্র রাস্তায়, ৫৪তম শিখ, নবম গোর্খা ও সিন্ধ রেজিমেন্টের ৫০ জন সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল। মাইকেল ও 'ডাইয়ার, পঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, যেন 'গদর' বিদ্রোহের গন্ধ পেয়েছিলেন! যেন ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অশনিসংকেত! ও 'ডাইয়ারের নির্দেশেই পাঁচ হাজার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনকারী নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধকে মেশিনগানের শেষ গুলিটি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সারা দেশে এই বীভৎস সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল। বর্ষিয়ান ইংরেজ মিশনারি মারসেলা শেরউডকে অপরহরণ করলেন কিছু আন্দোলনকারী। ধরপাকড় তীব্র হলো। হিংস্র ইংরেজ প্রতিশোধ নিল পথচারীদের 'কুচ্চা কুরিচন' মানে বুকে হেঁটে রাস্তা পার হবার শাস্তি দিয়ে।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা কিশোর শুকদেবকে মর্মাহত করে। এই ঘটনার জেরে, ব্রিটিশরা 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম' করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে। স্যার জন সাইমন এবং ক্লিমেন্স এটলি ১৯২৭-এর নভেম্বরে, ভারতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংবিধান লাগু করার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুইটারি কমিশন গঠন করেন। ভারত ছিল উপনিবেশবাদের সবথেকে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এই ক্লিমেন্স এটলিই পরে লেবার পার্টির প্রধান ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 'সাইমন কমিশন' ভারতে এলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ও গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস-এর তীব্র বিরোধিতা করে। পুরো পঞ্জাবে ৩০ অক্টোবর ১৯২৮ লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। জেমস স্কট নামের এক পুলিশ সুপার নিজে নির্দয়তার সঙ্গে লালাজীকে লাঠিপেটা করে। লালাজী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে ১৭ নভেম্বর ১৯২৮-এ মারা যান। এই করুণ দৃশ্যের সাক্ষী শুকদেব সেদিনই স্কটকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেন। শুকদেব, রাজগুরু, ভগত, জয়গোপাল ও চন্দ্রশেখর আজাদরা এক মাসের মধ্যেই প্রতিজ্ঞাটি নিষ্পন্ন করলেন।

১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে শুকদেব, রাজগুরু ও ভগত গুলি চালিয়ে প্রতিশোধ নিলেন। সাদৃশ্যতার কারণে ভুলবশত স্কটের বদলে অন্য অফিসার জন পি সান্ডার্স গুলিতে মারা গেল। সান্ডার্সের হত্যার পর ভগতকে লাহোর থেকে বাইরে বের করার গুরুদায়িত্ব ছিল শুকদেবের উপর। বিপ্লবী ভগবতীচরণ ভোরার ধর্মপত্নী দুর্গাভাবী ও ভগত সিংহ স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মবেশে লাহোর থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ চলে এলেন। শুকদেব-সহ অন্যান্য বিপ্লবীরাও বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের আইনসভায় জনরোষের অভিব্যক্তিতে বোমা বিস্ফোরণের কথা ভগত সিংহ জানতেন। তাই বটুকেশ্বর ও শুকদেবকে দিয়ে দিল্লির অ্যাসেম্বলি হলে বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে ব্রিটিশকে বিপ্লবের পূর্বাভাস দিতে এবং নিজে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু বেশি বাগ্মী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বলে ১৯২৯-এর ৮ এপ্রিল, শুকদেবের বদলে ভগত সিংহ নিজে ও বটুকেশ্বর ছদ্মবেশে সাদা পুলিশের বেষ্টনি ভেদ করে, ভীষণ শব্দ ও ধোঁয়া উৎপন্নকারী দুটি বোমা সভাহলে ফাটালেন ও পাবলিক সেফটি বিল, বাণিজ্যিক বিতর্ক এবং লালাজীর হত্যার কথা লেখা পোস্টারগুলি দ্রুত ছড়াতে লাগলেন। চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'! চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে আইনসভা বাতিল হলো। ঘটনাটি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে ছাপা হলো। এর কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ লাহোরের বোমা কারখানার খোঁজ পায়। সাহারানপুর আর লাহোরে বোমা তৈরি কারখানার গুরু দায়িত্ব শুকদেবের উপরেই ছিল। ১৫ এপ্রিল, ১৯১৯

সালে লাহোরে বোমা কারখানায় শুকদেব, কিশোরীলাল, যতীন্দ্রনাথ ও রাজগুরু ধরা পড়লেন। মোট ২১ জন প্রভাবশালী বিপ্লবী জেলবন্দি হলেন। শুকদেবকে তিনটে কেসে গ্রেপ্তার করা হয়, লাহোর ষড়যন্ত্র ও বোমা কারখানা, সান্ডার্সের হত্যা ও অ্যাসেম্বলি হলে বোমা বিস্ফোরণ।

দিল্লি অ্যাসেম্বলি বোমা মামলার শুনানিতে ভগত সিংহ নিজেই শুদ্ধ ইংরেজিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। অন্যদিকে বটুকেশ্বরের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার আফসর আলি। ভগত বলেছিলেন, 'শক্তি যখন আগ্রাসনে পরিণত হয় তখন তা অমার্জনীয় হয়'। বেআইনি অস্ত্র আইনের ধারায় এবং বোমা বিস্ফোরণের অপরাধে, সেই শুনানিতে তাদের আজীবন কারাবাসের শাস্তি শোনানো হয়। সেসময় কারাগারে রাজগুরু, যতীন দাস ও ভগত সিংহ সমেত বহু বিপ্লবীর উপর নিদারুণ অত্যাচার চলতে থাকে। রাজনৈতিক কয়েদিদের মর্যাদা আদায়ের জন্য শুকদেব সকলের সঙ্গে আমরণ অনশন সত্যাগ্রহে বসেন। ভগত সিংহ ১১৬ দিন অনশন করে শেষে কংগ্রেসী নেতাদের আশ্বাসে ৫ অক্টোবর ১৯২৯ সালে অনশন ভঙ্গ করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তখন চতুর্দিকে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। যতীনদাস ৬৪ দিন অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন।

সান্ডার্স হত্যা মামলার যখন শুনানি শুরু হয়, আদালতে ভগত ও শুকদেবের তীব্র প্রতিবাদ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদের' আওয়াজে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে যায়। বাইরে অপেক্ষারত জনরোষের শিকার হয়েছিল বহু সাদা চামড়ার অফিসার। দেশের সর্বত্র তড়িৎগতিতে পৌঁছে যাচ্ছিল দিল্লির আদালতে ভগত সিংহ ও শুকদেব থাপারের সিংহনাদের কাহিনি!

যারা বলেন, 'বিনা খড়্গ, বিনা ঢাল, সবরমতিকে সন্ত নে কিয়া কামাল', তাঁরা বিবেকের কাছে কি কৈফিয়ত দেবেন? ওই তিনজন ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিরই অল্পবিস্তর সাজা হয়। বটুকেশ্বর দত্তের কালাপানি হয়। ১৯৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে শেষ জীবন নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এই বঙ্গবীর দিল্লিতে ২০ জুলাই ১৯৬৫ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে, অন্য রাজনৈতিক বন্দিদেরও মুক্তি ঘোষণা করে। শুকদেব জেলে বসেই গান্ধীজীকে চিঠি লিখে

পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় শুকদেবের বসতবাটি।

জেলবন্দি রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্ধারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দেননি। সেই চিঠি ২৩ এপ্রিল, ১৯৩১ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ছাপানো হয়। সেই চিঠিতে উনি আক্ষেপ করেছিলেন, 'যে ব্রিটিশের দেওয়া ফাঁসির জন্য আপশোশ হচ্ছে না; হচ্ছে দেশের মধ্যে বসে থাকা নিষ্ক্রিয় তথাকথিত নেতাদের অসহযোগিতায়। তাঁরা আমাদের কথা সঠিকভাবে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন না'। আজকের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা অজিত দোভালের ভাষণেও ওই খেদোক্তি শোনা যায়, 'দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু নেতারা মাওবাদী ও জেহাদিদের সমর্থন করে দেশের অখণ্ডতাকে বিঘ্নিত করছেন।

সান্ডর্স হত্যা মামলার শুনানি ধীরগতিতে চলছিল। তাই এক বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা করা হলো। লর্ড আরউইনের নির্দেশে, ১ মে, ১৯৩০-এ জাস্টিস জে কোল্ডস্ট্রিম, আগা হায়দার ও জি সি হিলটন— এই তিন বিচারকের এজলাসে মামলা উঠল। অভিযুক্তদের অনুপস্থিতেই আদালতে একতরফা শুনানি চলছিল। ৭ অক্টোবর, ১৯৩০-এ ৩০০ পাতার রায় বেরুল। তাতে শুকদেব, রাজগুরু এবং ভগত সিংহকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হলো। ভগত সিংহ আগেই সান্ডার্সকে গুলি করার কথা স্বীকার করেছিলেন। শুকদেবের ক্ষেত্রে, দিল্লি পার্লামেন্টে বোমা বিস্ফোরণ, সাইমন কমিশন ও সান্ডার্স হত্যা মামলায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পওয়া সত্ত্বেও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটেনে ভারত বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি যাতে ভোটব্যাঙ্ককে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল না করে বসে, তাই ইংল্যান্ডবাসীদের খুশি রেখে, সরকারে থাকা লেবার পার্টি সেদিন এই অমানবিক রায় দিতে বাধ্য হয়েছিল। সাদা চামড়ার সান্ডার্সের মূল্য যে কালা চামড়ার নেটিভদের চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ্য, সেদিন সভ্য সমাজের প্রতিভূ ব্রিটিশ সরকার, সেটাই প্রমাণ করেছিল।

২৪ মার্চ ১৯৩১ সালে সকালের পরিবর্তে ২৩ মার্চ সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে লাহোর জেলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হলো। শুকদেবের অন্তিম ইচ্ছা, 'ফাঁসির বদলে ফায়ারিং স্কোয়াডে মরা' অসম্পূর্ণই থাকল! বর্তমান পাকিস্তানে শতদ্রুর তীরে হুসেনিওয়ালায় ভারতমায়ের তিন সন্তানের সৎকার করা হলো। মৃত্যুর সময় ভগত সিংহ ও শুকদেবের বয়স হয়েছিল মাত্র ২৩ ও শিবরাম রাজগুরুর হয়েছিল মাত্র ২২ বছর। ২৩ মার্চকে 'শহিদ দিবস', ১৯৮৭ সালের আগস্টে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত, 'শহিদ শুকদেব কলেজ অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের' স্থাপনা এবং লুধিয়ানায় 'শহিদ শুকদেব আন্তঃরাজ্য বাস পরিসেবার' উদ্ঘাটনের দ্বারা শহিদ শুকদেব থাপারের স্মৃতিকে অমর করে রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র ভারতবাসী করছে।

মহাকাশ

একঘর ভর্তি ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ বিস্ময় ভরা। ঠাম্মি বলে চললেন, 'রাক্ষসের ছেলে হয়েছে, রাক্ষসী মায়ের ইচ্ছে বেশ ঘটা করে ছেলের মুখে 'ভাত' দেবে। তোড়জোড় শুরু হলো রাক্ষসপুরীতে। অতোগুলি রাক্ষস খাবে, তাই আয়োজনও চলছে সেরকম। উঠোনে বাঁধা গোটা পঞ্চাশ হাতি। উনুনে কড়াই চাপানো হয়েছে, তাতে ঢালা হয়েছে তেল। তেল গরম হলেই আস্ত হাতিগুলোকে নুন-হলুদ মাখিয়ে তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। গরম হাতির ঝোল রাক্ষসদের জন্য ভারী সুস্বাদু। সন্ধ্যেবেলার চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়ছে ঘরে। ঠাম্মি আর নাতিদের মধ্যে গল্প একদম জমে উঠেছে। এক নাতি হঠাৎ বলে বসল, 'ওমা এত হাতি একসঙ্গে কড়াইয়ে ছেড়ে দেবে? কড়াইটা তাহলে কত বড়ো?' ঠাম্মি উত্তর দিল 'খুব বড়ো'। সঙ্গে সঙ্গে নাতিরা

একজোট হয়ে বলল, 'কত বড়ো ঠাম্মি'? আমাদের সামনের মাঠটার মতো, না আরও বড়ো। তাহলে কি এ শহরটার সমান। ঠাম্মি বললেন, না নাও তার চাইতেও বড়ো, ওই আকাশটার সমান। আর কোনো প্রশ্ন নেই। নাতিরা বলল 'তাই বুঝি'? গল্প এগিয়ে চলল। আকাশ যে কত বড়ো আর একটা ধারণা পেয়ে গেল নাতিরা। অতএব আর কোনো প্রশ্ন গেল না ঠাম্মির কাছে।

তবে সত্যি ঠাম্মি কি জানে মহাকাশ ঠিক কতটা বড়ো? কত কত বড়ো পণ্ডিত, জ্যোর্তিবিদ বছরের পর বছর ধরে এর আয়তন মাপতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন। কতরকমের আঁকাআঁকি, হিসেবপত্র করা হয়েছে, কিন্তু সীমানা ঠিক কোথায়? যুগ যুগ ধরে চলছে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা অবিশ্বাস্য কত কিছু যে মহাকাশ নিয়ে রচিত হয়েছে। অসীম, অনন্ত, গভীর এই মহাকাশ। মহাকাশ যদি হয় সমুদ্র তবে পৃথিবী হলো তার এক ফোঁটা জল।

দিনের বেলায় মহাকাশ বলতে ছোটরা তোমরা বোঝ আলোর বিচ্ছুরণে ভরা সাদা গোলাকার একটি বস্তু সূর্য যা দিনের আকাশে জ্বলজ্বল করে। যার দিকে তাকানো যায় না এতটাই তার তেজালো রশ্মি। তোমরা কি জানো সূর্য পৃথিবীর থেকে কতটা বড়ো? যদি ১৩ লক্ষ পৃথিবীকে একত্র করা হয় তবে তা হবে সূর্যের সমান। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এই সূর্যকে মাঝখানে রেখে পৃথিবী ও গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করছে। এই গ্রহগুলি যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত সূর্যের রাজত্ব। যার নাম সৌরজগৎ। কিন্তু মহাকাশের তুলনায় এই সৌরজগৎ কিছু না। সৌরজগতের বাইরে যে বিশাল মহাকাশ আছে তাতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আলোকবিন্দু যাদের আমরা নক্ষত্র বলি। খালি চোখে আমরা পৃথিবীর এক এক গোলার্ধ থেকে তিন হাজার তারা দেখতে পাই। কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখলে তার পরিসংখ্যা বহুগুণ বেশি। বিজ্ঞানীরা কয়েকশো কোটি তারার সন্ধান পেয়েছেন।

অনামিকা দে

ভারতের বিপ্লবী

অনিল দাস

বিপ্লবী অনিল দাস ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগদান করেন। সংগঠন বিস্তারের জন্য তাঁকে রংপুরে পাঠানো হয়। এক সময় কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারার জন্য তিনি তিনজন বিপ্লবী-সহ ডালহৌসি স্কোয়ারে যান। বোমা নিক্ষেপের সময় দুর্ভাগ্যবশত তিনি নিজেই নিহত হন। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ১৮ জুন। এমএসসি পাশ করে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য বিপ্লবীদলে যোগ দেন। ব্রিটিশের খাতায় তিনি 'হার্ডকোর টেররিস্ট' নামে লিপিবদ্ধ ছিলেন। কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে তাঁর আবক্ষমূর্তি রয়েছে।

জানো কি?

- প্রথম অলিম্পিক খেলা শুরু—৭৭৬ খ্রিস্টপূর্ব।
- প্রথম 'এশিয়ান গেমস' শুরু হয়—ভারতে।
- ভারতের খেলা গবেষণাগারটি—পাটিয়ালা অবস্থিত।
- খেলোয়াড় মিলখা সিংহ উড়ন্ত শিখ নামে পরিচিত ।
- 'আগা খান কাপ' হকি খেলার সঙ্গে যুক্ত।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক খেলার সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত।
- খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'টাইগারউড'— গল্ফ।

ভালো কথা

দুঃখের মধ্যে আনন্দের সন্ধান

দুঃখের কারণ এটাই যে আমার এক প্রিয় দাদু মারা গেছে। সেই দাদুর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে আমরা সব ভাই বোন এক জায়গায় বসে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় হবার পর এত মজা করেছিলাম যে আমরা মুহূর্তে দাদুকে হারানোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মজা করার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলিও কেটে যাচ্ছিল। আমার আর এক দাদুও আছে যে আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করত। সেই দাদু আমার কবিতা শুনতো। মনে হতো যেন এখানে নাচ, গান, খেলা, আবৃত্তি ইত্যাদির অনুষ্ঠান হচ্ছে। দেখতে দেখতে সবার বাড়ি ফেরার দিন হয়ে গেল। ফেরার দিনে আমার এক দিদি আছে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। এভাবেই সবাই সবার বাড়ি ফিরল আর আনন্দের দিন কাটানো শেষ হয়ে গেল।

রুদ্রাঙ্কুশ ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণী, ত্রিমোহিনী, দ: দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) পু ব পন	(১) ই ম ধো রা লা
(২) ধা মো ন রা	(২) ম জা য় তী স

১৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) শ্যামাপ্রসাদ (২) বিধানচন্দ্র

১৬ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) বুদ্ধিজীবী (২) বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর। (৩) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (৪) অর্চনা মাহাত, ডুড়কু, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

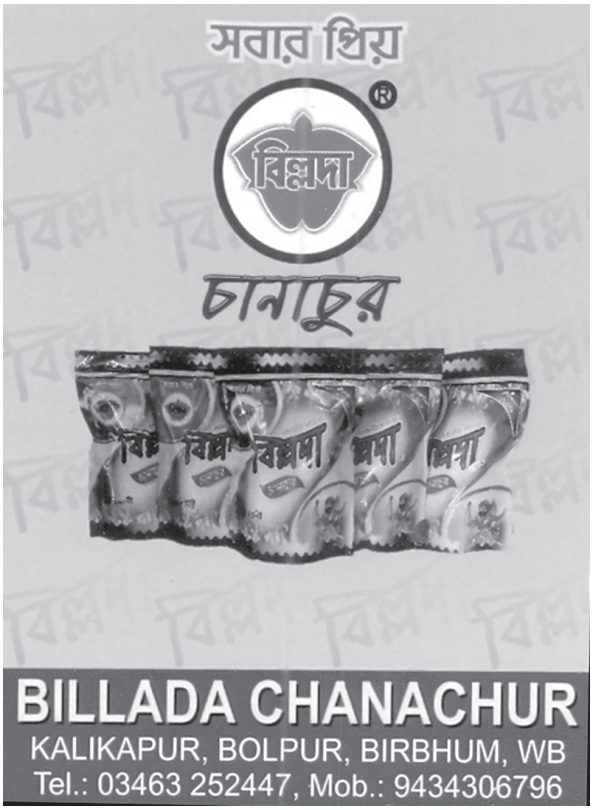

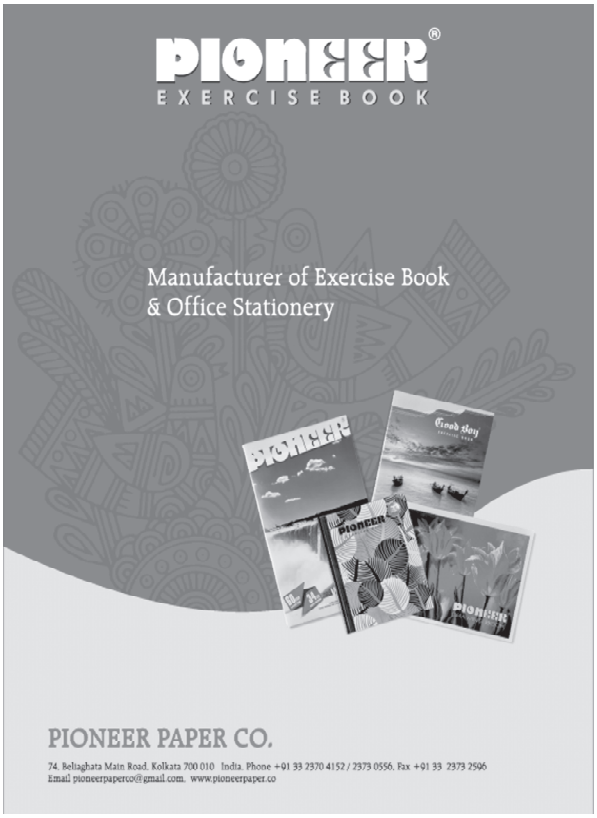

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় তালিবানি শাসনই চলছে

আমাদের রাজ্যে একদল ভোটে জিতলে তার বিরোধী দলের বাড়ির মা-মেয়েদের সম্মান মর্যাদা কিছুই থাকে না। তারা পরিণত হয় শাসক দলের নেতাদের ভোগ্যবস্তুতে। আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনে এর থেকে আলাদা কিছু হচ্ছে নাকি?

দীপ্তাস্য যশ

২ মে ভোটের ফল বেরোনোর পরবর্তী হিংসায় ৫৩ জন মহিলা ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন নির্মমতার রাজ্যে।

২ মে ভোটের ফল বেরোনোর পরেই অভিজিৎ সরকারকে কাঁকুড়গাছিতে তার বাড়ির সামনেই পিটিয়ে মারা হয়েছে। নৃশংসতার পরিমাণ ঠিক কতোটা ছিল বোঝা যায় যখন দেখি তার পোষা কুকুর ছানাগুলোকে অব্দি পিটিয়ে মারা হয়েছে।

৫ মে নির্মমতার রাজ্যে ভোটে হেরে যাওয়া একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরে এযাবৎ ৪০ জন বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগকেই পিটিয়ে মারা হয়েছে নাহলে খুন করে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নির্মমতার রাজ্যে স্বামী বিজেপির হয়ে ভোটের সময় দেওয়াল লিখেছেন এই অপরাধে তার মূক বধির, পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে।

নির্মমতার রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রায় ১২ হাজার পরিবার গৃহহারা। চাষি খেত থেকে ফসল তুলতে পারেনি। চাষির বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুট করে নেওয়া হয়েছে আলুর বস্ত। যে আলু চাষে চাষি একটু লাভের মুখ দেখে। বস্ত না থাকলে আলু কোল্ডস্টোরেজ থেকে বার করে বিক্রি করা যাবে না। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে তারা বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে নিজেদের জমিতে চাষ করতে পারবে না। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু ছোট দোকানদারের গুমটি।

নির্মমতার রাজ্যে বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। নির্মমতার রাজ্যে বাবা বিরোধী দলের কর্মী হওয়ার অপরাধে ধর্ষিতা হয়েছে তার নাবালিকা মেয়ে। পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ অভিযোগটুকু নিতে অস্বীকার করেছে। শেষমেশ তাদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের, বিচারের আশায়।

আমি নিজে এমন একজন মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যাকে বেশ কিছুদিন বাধ্য হয়ে ক্যানিং পূর্ব এলাকায় এক তৃণমূল নেতার মনোরঞ্জন করতে হয়েছে নিজের স্বামী এবং পুত্রের প্রাণরক্ষার্থে। তার অপরাধ? অপরাধ তিনি শাসক দলের পক্ষে ছিলেন না।

আচ্ছা বলুন তো এই যে আফগানিস্তান তালিবানদের দখলে চলে গেল তাতে সবথেকে বেশি আমরা কাদের নিয়ে চিন্তিত? তাদের মেয়েদের নিয়ে। কেননা শরিয়া শাসনে মেয়েদের কোনও অধিকার নেই। এমনকী কোনও মেয়ে ধর্ষিতা হলেও দায় সেই মেয়ের। ধর্ষকের নয়। সেখানে চাকরি করার অপরাধে মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে অবিবাহিত বা বিধবা মেয়েদের খোঁজে। কারণ তাদের যৌনদাসী বানানো হবে। বলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার যে কয়টি উদাহরণ দিলাম— প্রায় ৬০ জন মহিলার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গণধর্ষণের অভিযোগ পেয়েও পুলিশের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করা, গণধর্ষণে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করার ঘটনাগুলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে ঠিক কোথায় আফগানিস্তানের থেকে আলাদা করছে? কোথাও করছে কি? সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে যে বক্তব্য উঠে এসেছে তাতে কি পশ্চিমবঙ্গকেও প্রায় আফগানিস্তান বলেই মনে হচ্ছে না আমাদের ভোটে হেরে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্মমতার দৌলতে?

সারা বিশ্ব আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন নিয়ে চিন্তিত। আর আপনি আমি এখানে তালিবানি শাসনেই বাস করছি। তফাত এই যে যেহেতু এখনও কেন্দ্রে একটা শক্তপোক্ত সরকার আছে, আইন আদালত আছে তাই এই তালিবানি শাসন সর্বাত্মক নয় এখনও। আপনি আমি এখনও সরাসরি আক্রান্ত নই। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের কোনায় কোনায় কিছু জায়গায় এই তালিবানি শাসনই চলছে। যেখানে একদল ভোটে জিতলে তার বিরোধী দলের বাড়ির মা-মেয়েদের সম্মান মর্যাদা কিছুই থাকে না। তারা পরিণত হয় শাসক দলের নেতাদের ভোগ্যবস্তুতে। আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনে এর থেকে আলাদা কিছু হচ্ছে নাকি? আলাদা খালি এটাই যে এখানে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। তার কারণ এই নয় যে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে যে অত্যাচার হিন্দুদের মা মেয়েদের উপরে চালানো হচ্ছে তা শহরে চালানোর মতো তাদের ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা যে আছে তা মাঝেমাঝেই কিছু ঘটনা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু তারা এখনও তাদের ইচ্ছামতো পুরোদস্তুর অত্যাচার চালাতে পারছে না। কারণ দেশে একটা শক্তপোক্ত সরকার আর আর্মি থাকার জন্য তারা সাহস পাচ্ছে না। নাহলে রাজনীতির আড়ালে আর ফেডারেল স্ট্রাকচারের সুবিধা নিয়ে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু

ফঃ ৬

জায়গা যেমন মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুর, বসিরহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটের মতো জায়গায় প্রায় তালিবানি শাসন ব্যবস্থাই কায়েম করেছে। যেমন মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু গ্রামে টিভি, গান, বাজনা এসব নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর আমাদের ঘরের পাশের বাংলাদেশ তো আছেই। সেখানে এখন দুর্গা পুজো আর শারদীয় উৎসব নয়, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মূর্তি ভাঙ্গাই শারদ উৎসব। সেখানের হিন্দুরা কীভাবে আছেন সে তো গত তিরিশ বছরে হিন্দুদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়।

১৯৯৬ সালে দেখেছিলাম তালিবানরা যখন প্রথমবার আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করল, সে দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্টকে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল খুন করে। সেই প্রথমবার দেখেছিলাম। আর গত পাঁচ বছরে সেই দৃশ্য দেখেছি প্রায় দুশো বার। ত্রিলোচন মাহাতো থেকে শুরু, তারপরে একের পর এক খুন করে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনা এই রাজ্যেও ঘটে গেছে।

তাই যারা ভাবছেন আফগানিস্তানে তালিবান শাসন কায়েম হওয়ায় সবথেকে বড়ো বিপদ ভারতের কাশ্মীর নিয়ে, তারা ভুল ভাবছেন। সবথেকে বড়ো বিপদ আমাদের। এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের। খবরে তো ইতিমধ্যেই আমরা পড়েছি বাংলাদেশ থেকে 'বাঙালি তালেবানরা' আফগানিস্তানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আর এই রাজ্যের খবর? এখান থেকে কজন আফগানিস্তান পাড়ি দিতে চান আমরা কি জানি? কয়েকদিন আগে তৃণমূলের এক প্রাক্তন সাংসদ তালিবানের নিন্দা করে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন। সেই পোস্টের কমেন্ট সেকশানে তাকে কিছু তালিবান প্রেমী তার 'ভুল ধারণা' সংশোধন করে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছেন। তারা সবাই যে বাংলাদেশের নাগরিক এমনটা নয়। তাহলে তারপরে এখান থেকে কেউ আফগানিস্তানে যেতে চায় না সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত? পশ্চিমবঙ্গেও যে তালিবানদের প্রতি সমর্থন কিছু কম নেই তা তো গত কয়েকদিনেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদে 'পাঠকদের' মন্তব্য থেকে। আর সেই সাথে 'শিক্ষিত' তালিবানপ্রেমীদের 'তালিবান আর আরএসএস এক' মার্কা ঘুরিয়ে নাক দেখানো তো আছেই। আদতে এরা তালিবানকে আরএসএসের সঙ্গে এক করে দিয়ে তালিবানকে লেজিটিমেসি দিতে চান। নাহলে এরাও জানেন তালিবান আর আর এস এস এক হলে এনারা সে কথা বলার মতো সুযোগ পেতেন না।

আফগানিস্তান তালিবানি দখলে যাওয়ার পরে অনেকেই প্রশ্ন করছেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কোথায়? তারা কেন কিছু বলছেন না? আরে, যদি আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করতে হয় তাহলে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে না কি? প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকলে তো পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা নিয়েও করতে পারতেন। কিন্তু তাদের গলায় তো অলরেডি তালিবানি বেল্ট পরিয়ে তাদের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই খুঁটির আশপাশে চরেই তাদের ঘাস খেতে হবে। তার বাইরে যাওয়ার উপায় তাদের নেই। তাই তাদের মুখে এখন খালি একটাই কথা, 'ওরা তো সাংবাদিক বৈঠক করেছে'।

তবে সবথেকে বিনোদনের হচ্ছে বামেদের হিরন্ময় নীরবতা। এদের নীরবতা দুটো কারণে। এক তো এরা ভাবছে আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের প্রতিবাদ করলে, এখানে 'বিজেপি এসে যাবে'। ঠিক সেই কারণেই ভোট পরবর্তী হিংসায় তাদের সমর্থক কর্মীরা আক্রান্ত হলেও তারা চুপ থেকেছেন। কারণ কিছু বললে যদি 'বিজেপি এসে যায়'! দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানে চীনের স্বার্থ।

অনেকেই হয়তো জানেন না পৃথিবীর সবথেকে বড়ো কপার অর্থাৎ তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে আফগানিস্তানে। প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলারের তামা, লিথিয়াম আর সোনার খোঁজ পাওয়া গেছে আফগানিস্তানে। আধুনিক পৃথিবীতে যে দুই খনিজের চাহিদা সবথেকে বেশি বাড়ছে তার একটা হলো তামা আরেকটা হলো লিথিয়াম। আগামী দিনে গাড়ি চলবে বিদ্যুতে। সেই বিদ্যুৎচালিত গাড়ির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি বস্তু হলো লিথিয়াম আর তামা। একটি বিদ্যুৎ চালিত গাড়িতে মোটামুটি ভাবে ৬০ থেকে ৮৩ কেজি তামা লাগে। আর লিথিয়ামের ব্যবহার হয় রিচার্জেবেল ব্যাটারিতে। এর আগে ব্রিটিশরা, তারপরে সোভিয়েত, বর্তমান সময়ে আমেরিকা আফগানিস্তানে নিজেদের কবজা বজায় রাখতে চেয়েছে মূলত স্ট্র্যাটেজিক কারণে। কারণ আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান।

ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের দখল নিতে চেয়েছিল মূলত সোভিয়েতের ভয়ে। কারণ তাদের দুশ্চিন্তা ছিল সোভিয়েত রাশিয়া যদি আফগানিস্তান দখল করে নেয় তাহলে তারা অচিরেই তৎকালীন ভারতবর্ষ, বর্তমান পাকিস্তানের এক বিশাল অংশ দখল করে ফেলবে। এমনকী ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরও দখল করে নিতে পারে। ঠিক যে দুশ্চিন্তা আমরা এখন করছি কাশ্মীর নিয়ে। যে আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন মানে কাশ্মীর উপত্যকায় আবার জঙ্গিদের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ে আফগানিস্তান দখলে থাকা মানে ভারত আর মধ্যপ্রাচ্য বা আরবের মধ্যে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণও চলে যেত সোভিয়েতের হাতে।

একইভাবে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ ছিল মুসলমান। তাই আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের প্রভাব বৃদ্ধি মানে আফগানিস্তান সংলগ্ন তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানেও তাদের জন্য সমস্যা বৃদ্ধি। সেই সমস্যাকে দূর করতে আর সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্যই সোভিয়েত আফগানিস্তানের দখল পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে বাধ সাধলো তাদের নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা। সোভিয়েত আফগানিস্তান ছাড়ার পরে পরেই সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যায়। সেই সাথে সেই সময়ে আমেরিকাও ভিয়েতনামে নিজেদের পরাজয় হজম করতে না পেরে সোভিয়েতের জন্য তালিবান সমস্যার সৃষ্টি করে। যে তালিবানরাই এখন আবার আমেরিকার জন্য আরেকটি 'ভিয়েতনাম' পরিস্থিতি তৈরি করল।

আমেরিকার আফগানিস্তানে যাওয়ার মূল কারণ ছিল ২১/১১-এর হামলা। যাকে আমাদের অনেক বিপ্লবীরা 'পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বলে থাকেন। যদিও সেই সন্ত্রাসী হানায় আদৌ কোনও পুঁজিবাদী মারা যাননি। যারা মারা গেছিলেন তারা আমার আপনার মতোই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আর ঠিক এই কারণেই সেই সময়ে আমেরিকাকে তালিবানদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতেই হতো। কারণ সে দেশের জনমত তাই চাইছিল। সেই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ লাদেনকে খুঁজে বার করার পর থেকেই কিন্তু আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার তোড়জোড় শুরু করেছিল। কারণ সেই জনমত। আফগানিস্তানে যে আমেরিকান সৈন্যরা মারা যাচ্ছিল তারাও সেদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের ছেলেই ছিল। তাই লাদেন মারা যাওয়ার পর আর আমেরিকার মানুষ তাদের ছেলেদের প্রাণহানি মেনে নিতে রাজি ছিল না।

তবে ব্রিটেন, রাশিয়া আর আমেরিকার থেকে চীনের আফগানিস্তানে স্বার্থটা একটু আলাদা। পুরোপুরিই ব্যবসায়িক স্বার্থ।

রাশিয়া আফগানিস্তানে থাকার সময়েই

পশ্চিমবঙ্গেও চলছে বিরোধীদের ওপর তালিবানি আক্রমণ।

প্রথম সেখানে খনিজ সম্পদের খোঁজ শুরু করে। যে সম্পদের খোঁজ পায় পরবর্তীতে আমেরিকা। আগেই বলেছি আগামীদিনে পেট্রোলের থেকেও বেশি চাহিদা হতে চলেছে তামা আর লিথিয়ামের। আর চায়নার সাত তাড়াতাড়ি তালিবানদের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ এই তামা আর লিথিয়াম। ঠিক যেমন পেট্রোলের জন্য আমেরিকা আর সৌদি আরবের সম্পর্ক। সৌদি আরব আর তালিবানে তফাত কী? দুই দেশেই শরিয়া চলে। সৌদিতেও মানবাধিকার নামের কোনও বস্তু নেই। সেখানে অবশ্য খাতায় কলমে আইনের শাসন আছে একটা। কিন্তু সেই আইন কেমন? সেই আইনে কোনও মেয়ে ধর্ষিতা হলে অভিযোগ করার জন্য তাকে দশ জন সাক্ষী জোটাতে হবে। এর নাম কি আইনের শাসন? ঠিক তেমনই ভাবে চীনের সৌদি আরব হচ্ছে আফগানিস্তান। সেই কারণেই নিজেদের স্বার্থে তারা বিভিন্ন পিআর এজেন্সিকে চালু করেছে। তারা তাই তালিবানরা সাংবাদিক বৈঠক করলেই গদগদ হয়ে পড়ছে। কেউ আবার আমাদের জানাচ্ছেন তালিবানরা সহি মুসলমান নয়। কেউ বা আবার নেহাত বাধ্য হয়ে বলছে তালিবান আর আরএসএস এক।

আফগানিস্তান শুধুমাত্র তালিবানদের দেশ নয়। আফগান বৌদ্ধদেরও দেশ। সেইরকম বৌদ্ধ ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত একটি শহর হচ্ছে মেস আয়নাক। সেই মেস আয়নাকে ২০০৬ সালে পৃথিবীর সব থেকে বড় তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, পরিমাণ প্রায় ৪৫০ মিলিয়ান মেট্রিক টন। আগেই বলেছি আগামীদিনে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির কারণে তামার বাজারদর প্রভূত পরিমাণে বাড়তে চলেছে। কয়েক বছর আগে যেমন পেট্রোলের দখল রাখার জন্য ইরাক যুদ্ধ হয়েছে। ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শত্রুতা। সৌদির সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্ব। অর্থাৎ বিশ্বরাজনীতিতে পেট্রোপণ্য অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে তেমনই আগামীদিনে তামা একই ভূমিকা পালন করবে।

এখন পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ তামা উৎপাদনকারী দেশগুলি হলো, চিলি, পেরু, চায়না, কঙ্গো, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, জাম্বিয়া, মেক্সিকো, কাজাখাস্তান, কানাডা ও পোল্যান্ড। চিলির উৎপাদন ক্ষমতা ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫.৭ মিলিয়ান মেট্রিক টন, পেরুর উৎপাদন ক্ষমতা ২.২ মিলিয়ান মেট্রিক টন। আর আছে অস্ট্রেলিয়া, জাম্বিয়া, কঙ্গোর মতো দেশগুলো। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে দশটা সর্ববৃহৎ উৎপাদক দেশ যে পরিমাণ তামা উৎপাদন করতে পারে, একা মেস আয়নাকের খনি থেকে তার দ্বিগুণ পরিমাণ তামা উৎপাদন করা সম্ভব। আর চায়নার নজর ঠিক এখানেই।

বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি ভেবে দেখেন তাহলে জাম্বিয়া, কঙ্গো ছাড়া অন্য বৃহৎ উৎপাদক দেশগুলির কাছ একচেটিয়া কারবার স্থাপনে চীন বিশেষ সহায়তা পাবে না। চিলি, পেরু, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে চীন কখনই একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পাবে না। কাজখাস্তানের তামার ভাগ রাশিয়াকে দিতেই হবে খানিক। তাই একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য চীনের দরকার আফগানিস্তানের বিশাল তামা আর লিথিয়াম ভাণ্ডারের উপরে নিয়ন্ত্রণ।

২০০৯ সালে মেটালর্জিক্যাল কর্পোরেশান অব চায়না আর জিয়াংসি কপার কর্পোরেশন যৌথভাবে এই খনি থেকে তামা উত্তোলনের জন্য বরাত পায়। কিন্তু তারপর ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় কোনও কাজই হয়নি। কারণ হিসাবে অনেক কিছুই বলা হয় সরকারিভাবে। যেমন মেস আয়নাকের ঐতিহাসিক খনন কার্যে দেরি হওয়া একটি কারণ এখনও এই প্রোজেক্ট শুরু না হওয়ার পিছনে। তেমনিই আরেকটি কারণ হলো এই বরাত ঘিরে দুর্নীতির নানা অভিযোগ। পূর্বতন আফগান সরকার নতুন করে দরপত্র দেওয়ার চিন্তাভাবনাও শুরু করেছিল চীনারা এখনও কাজ শুরু না করায়। তবে তার থেকেও বড় কারণ যা চীনাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে তা হলো নিরাপত্তার কারণ। কিন্তু কথা হচ্ছে নিরাপত্তা কাদের থেকে? তালিবানদের থেকে? কিন্তু তালিবানরা তো চীনের বন্ধু পাকিস্তানের বন্ধু। আর বন্ধুর বন্ধু তো চীনেরও বন্ধু হবে। তাহলে সমস্যা কোথায়? বুঝতে অসুবিধা হয় না, সমস্যা আমেরিকা আমেরিকা কখনই চীনকে একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ করে দেবে না। সেই কারনেই পূর্বতন আফগান সরকারকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা চীনকে কাজ শুরু করতে দেয়নি এতদিন। কখনও বরাত নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত হয়েছে তো আবার কখনও

কাবুলে চীনের গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর তাই চীনের স্বার্থে আমেরিকার আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সেই সুযোগ এসে গেল করোনা মহামারীর দৌলতে। ভেবে দেখুন করোনার সবথেকে বেশি দাপট কোথায় দেখা গেছে? কোন দেশের অর্থনীতি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? উত্তর আমেরিকা, অন্যতম দেশ যারা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আর চীন ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তাছাড়া আমেরিকা যেভাবে নিজেদের অস্ত্রসম্ভার তালিবানদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে, তা থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার খনিজের যে বাজার আমেরিকা ছেড়ে গেল তা তারা পূরণ করতে চায় অস্ত্রবাজারের মাধ্যমে। কারণ আফগানিস্তানে তালিবান মানে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে অস্থিরতা। জঙ্গিরা এখন চীনা অস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু ভারত তো আর চীনা অস্ত্র কিনবে না। সেই বাজার খুলে রাখাই এভাবে নিজেদের অস্ত্র তালিবানদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার কারণ। আরও একটি কারণ হচ্ছে আমেরিকা দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও কোন আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান কোম্পানিকে আফগানিস্তানের খনিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য রাজি করাতে পারেনি, নিরাপত্তার অভাবের কারনে।

আমেরিকা লাদেনকে নিকেশ করার পর থেকেই আফগানিস্তান থেকে বেরোতে চাইছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তামা আর লিথিয়ামের দখল চীন পেতে চায়, তা আমেরিকা কেন হেলায় ছেড়ে দিল? প্রথম কথা আমেরিকা কখনই হেলায় ছাড়েনি। গত কুড়ি বছর আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে একদিকে যেমন অসংখ্য আমেরিকান সৈন্য মারা গেছে, তেমন অর্থও কম লাগেনি। এই সৈন্যমৃত্যুর কারণে তৈরি হওয়া জনমত আর মহামারীর দৌলতে তৈরি হওয়া অর্থনীতির ক্ষতই আফগানিস্তানে আমেরিকার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতল। খেয়াল করবেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাংবাদিক সম্মেলনে কী বলেছেন। তিনি পরিষ্কার করেই জানিয়েছেন আফগানিস্তান নিজে যদি পালটাতে না চায়, তাহলে আমেরিকার দায় নয় আফগানিস্তানকে উন্নত করার। অর্থাৎ তিনি আমেরিকার জনগণকে বোঝাতে চেয়েছেন আফগানিস্তানে কী হলো তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তিনি নিজের দেশ এবং দেশের মানুষ নিয়েই চিন্তিত। অবশ্য এছাড়া আর কিছু বলতেও পারতেন না আফগানিস্তানে আরও 'একটি ভিয়েতনামের' অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে।

যদিও ২০১৮ সাল থেকেই আমেরিকা এই নিষ্ক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেছিল, কিন্তু এই দুই কারণে তা ত্বরান্বিত হলো এবং আমেরিকা পুরোপুরি অপরিকল্পিত ভাবে সরল। যার জেরে আজকের অরাজক পরিস্থিতি আফগানিস্তানে। আর আফগানিস্তানের খনিজ ভাণ্ডার তাদের হাতছাড়া হলেও অন্যান্য অনেক খনিজ ভাণ্ডার এখনও তাদের নাগালের মধ্যেই আছে। যেখানে এতো বিনিয়োগের প্রয়োজনও নেই। তাই আমেরিকার ক্ষতি তেমন নয়। এরই সুযোগ নিল চীন। ঠিক যেভাবে আমেরিকা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে আফগানিস্তানের মাধ্যমে 'একটি ভিয়েতনাম' উপহার দিতে চেয়েছিল, একই ভাবে এখন চীন আমেরিকাকে তালিবান এবং পাকিস্তানের মাধ্যমে 'একটি ভিয়েতনাম' উপহার দিল। আমেরিকা সরে যাওয়ার সাথে সঙ্গেই চীনের প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের বন্ধুদের মাধ্যমে নিজেদের হাতে নেওয়া। সেই জন্যই চীনের সাত তাড়াতাড়ি তালিবানদের স্বীকৃতি দান। আমেরিকা ভেবেছিল পাকিস্তানের মাধ্যমে তারা আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সোভিয়েতের সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় করেও ছিল। পরে লাদেনকে পাকিস্তানেই খুঁজে পাওয়ার পরে তারা বোঝে পাকিস্তানের কাছে তারা ছিল এটিএম মেশিন। এখন চীনও ভাবছে তারা পাকিস্তানের মাধ্যমে তালিবানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু কতদিন পারবে সেটাই প্রশ্ন। খুবই সম্ভাবনা আছে চীন আফগানিস্তানে অর্থলগ্নি করলে পাকিস্তান চীনের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যার ফলে চীনকেও আফগানিস্তানে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে হতে পারে নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে। আজ যে বামেরা চীনের ল্যাজ ধরে তালিবানদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলছেন তারা তখন কী করবেন সে এক দেখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। তালিবানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সবথেকে বড়ো সমস্যা হলো, তালিবানের নেতা কোনও একজন নন। তাই আজ যতোই তালিবানকে একজোট মনে হোক, বছর ঘুরতে ঘুরতে সেই একই পরিস্থিতি থাকবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

পাকিস্তানকে চীন যেসব খাতে সবথেকে বেশি ধার দিয়েছে তার একটা হলো পরিকাঠামো আরেকটা হলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পে পাকিস্তানের কোন লাভই নেই। ভারত থেকে কাশ্মীর আলাদা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের দেশে কোনও শিল্পই তৈরি হয়নি যে শিল্পের জন্য তারা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ব্যবহার করতে পারবে। এমনকী ওই রাস্তায় সাধারণ পাকিস্তানি জনগণ চলাচল করলেও যে টোলট্যাক্স দেন, তাও চীনের রাজকোষেই যায়। পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্র হলো বিদ্যুৎ। সে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। তাই তারা হাত পেতেছিল চীনের কাছে। চীন কী করল। এই সুযোগে নিজেদের পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি নতুনের দামে বিক্রি করল পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের কাছে কেনার টাকা নেই। তাই ধারও দিল চীন। ধারের গ্যারান্টি কী? পরিকাঠামো ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সম্পত্তি। যেমন বিমানবন্দর, জাহাজ বন্দর। আচ্ছা আপনারা কি ভাবছেন চীন যে টাকা ধার দিয়েছে, সেই টাকা ওখান থেকে তুলবে। দূর, যে টাকা চীন পাকিস্তানকে ধার দিয়েছে সে টাকা তো কবেই তুলে নিয়েছে। ভাবছেন পাকিস্তান কীভাবে শোধ করল? বিশেষত সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি এখন বিয়ে বাড়ি হিসাবে ভাড়া দিতে হচ্ছে, সরকারের কোষাগারে টাকা নেই বলে। তাহলে? আরে সেই টাকা তো চীন যে দামে পাকিস্তানকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য নিজেদের পুরনো যন্ত্রপাতি বেচেছে তাতেই তুলে নিয়েছে, একেবারে সুদ সমেত। পাকিস্তান ভারতকে টাইট দেওয়ার জন্য চীনকে ডেকেছিল। এখন চীন পাকিস্তানের সামনে সুদখোর কাবুলিওলার রূপ ধরেছে। ভাবছেন পাকিস্তান এটা বুঝতে পারেনি? এতটাই বোকা? পাকিস্তান বুঝেছে, কিন্তু বুঝেও চীনকে কিছু বলার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা বুদ্ধি লাগিয়েছে। কী সেই বুদ্ধি? আফগানিস্তান ফ্রন্টকে আবার চাগিয়ে তোলা। প্রথমে তালিবানদের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়ে চীনকে সেখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া। তারপরে তালিবানদেরই একটা অংশ মারফত সমস্যা তৈরি করা। তখন আবার পাকিস্তানি আর্মি, আই.এস.আই চীনের জন্য ভাড়া খাটবে তালিবানদেরই একটা অংশকে সঙ্গে নিয়ে। আগেই বলেছি তালিবানদের যে কবে কোন অংশ কোন নেতাকে মানবে বা মানবে না তা কেউ বলতে পারে না।

আফগানিস্তানে এতদিন আমেরিকা একা খেলছিল। এখন এবার চীন, পাকিস্তান, রাশিয়া, ইরান, ভারত সবাই খেলবে যে যার মতো মাঠ বানিয়ে। তবে সবথেকে বেশি ইন্টারেস্টিং যে খেলাটা হবে সেটা হলো চীন আর পাকিস্তানের মধ্যে যে খেলা হবে, কারণ দুটো দেশের কোনওটারই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

রাজ্যের বিরোধীদের ওপর শাসকের আক্রমণের মতোই তালিবান বিরোধী আফগানবাসীদের ওপর নৃশংস তালিবানি আক্রমণ।

এই খেলা আরও জমিয়ে দিতে পারে ভারত। একদিকে যদি সৌদি আর আরব এমিরেটসের মাধ্যমে তালিবানদের একটা অংশকে ব্যবহার করতে পারে। আরেকদিকে যদি ইরানের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে মেরামত করতে পারে। সবকটা দেশের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ইরানই এমন একটা দেশ যার সঙ্গে বাকি কোন দেশেরই খুব ঘনিষ্ঠতাও নেই আবার চরম শত্রুতাও নেই। বিগত সাত বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের বিদেশনীতি দুর্দান্ত। কিন্তু তার মধ্যে একফোটা চোনা এই ইরান। ভারতের উচিত দরকারে ঘুরপথেও ইরানের থেকে তেল কেনা এবং সুসম্পর্ক স্থাপন করে আফগানিস্তানে নিজের স্বার্থের ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত করা। রাশিয়া এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে চীনের বিশেষ বিরোধিতা করার জায়গায় নেই। আর এই কারণেই ট্র্যাম্প একটা সময় চেষ্টা করেছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ করার ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ের কথা ভুলে গিয়ে।

অনেকেই বলছেন ভারত আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির কথা আঁচ করতে পারেনি এবং ভারতের কোনও প্রস্তুতিও ছিল না। এটা একেবারেই ভুল কথা। ভারত পাঁচ ছয় বছর আগেই এই পরিস্থিতি আঁচ করেছে এবং সেই অনুযায়ী ধাপে ধাপে পদক্ষেপও নিয়েছে। প্রথমত ভারত গত পাঁচ ছয় বছরে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব এমিরেটসের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার বিলোপ করেছে। ভাবুন আজকে আফগানিস্তানে তালিবান আর কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা, এই দুইয়ের যোগফল কী হতে পারত। তৃতীয়ত, ভারত গত পাঁচ বছরে বালুচিস্তানে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছে। চতুর্থত, ভারত আফগানিস্তানে নিজের একটা বন্ধুত্বসুলভ ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। কী ভাবছেন যে তামার উপরে চীনের নজর আছে সেই তামার উপরে ভারতের নজর খানিকটা হলেও নেই? এই প্রসঙ্গে কয়েকটা তথ্য না উল্লেখ করলেই নয়। বর্তমান তালিবান সরকারে যার প্রধান হওয়ার কথা চলছে সেই বরাদর একজন বালুচ। পাকিস্তান তাকে দীর্ঘদিন জেলে আটক করে রেখেছিল। ২০১৮ সালে আমেরিকা তাকে মুক্ত করে পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে। একটি মহলের যদিও বক্তব্য পাকিস্তান আসলে বরাদরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যই জেলে রেখেছিল। আরেকটি মহলের বক্তব্য পাকিস্তান আসলে বরাদরকে গ্রেপ্তার করেছিল কারণ তিনি আমেরিকার হাতের তামাক খাচ্ছিলেন। তাদের মত বরাদর যে সবসময় পাকিস্তানের কথা অনুযায়ী চলবেন তেমনটা নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের লোকাল গার্জেন চীনের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। আরও একটি তথ্য হলো বিগত পাঁচ ছয় বছরে আফগানিস্তানের বেশ কিছু উপজাতি নেতার সঙ্গে ভারতের সখ্য চোখে পড়ার মতো। কিছু কিছু বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের দাবি তালিবান আগ্রাসন শুরু হওয়ার পরে ভারত গোপনে সেদেশের তালিবান বিরোধীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। আগেই বলেছি তালিবানদের যে কখন কে নেতা তা কেউ জানে না। আজ আমেরিকা শত্রু ছিল তাই সবাই একজোট। কাল নাও থাকতে পারে। বিশেষত যদি কোনও শত্রু না থাকে। আর ভবিষ্যতের জন্য বালুচিস্তানে ভারতের বর্তমান প্রভাব তো কাজে আসতেই পারে। □

মানুষকে ভিখারি বানাবার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি মাননীয়া

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্য সরকার কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কেননা রাজ্যে সেই অর্থে উন্নয়ন শব্দটা বড়ো ফিকে হয়ে গেছে। রাজ্যে যেমন কোনো রকমের শিল্পায়নের ঘটনা ঘটেনি, তেমনি তৈরি হয়নি কর্মসংস্থানের সুযোগ। রাজ্য সরকার শুধুই ১০০ দিনের সাফল্য নিয়ে নাচানাচি করতেই ব্যস্ত। এই ১০০ দিনের যে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার পুরো কৃতিত্বই যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে। কেননা, এই সুযোগ তৈরির মূল কারিগর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের আর্থিক সাহায্যেই এই প্রকল্প। তাঁদের সহযোগিতাতেই এই কর্মসংস্থানের সুযোগ, সেটা মেনে না নেওয়ার মধ্যে তেমন একটা বাহাদুরি দেখা যায় না।

আসা যাক নতুন চালু হওয়া রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। একেবারে গোড়ায় বলে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি, এটা সাধারণ মানুষকে অনেকটাই বোকা বানাবার একটা কর্মসূচি। আপনারা বলতেই পারেন, দুর্জনের চোখে সবই খারাপ। আসলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যারা এই অতিমারিতে একেবারেই সব দিক দিয়ে মানসিক ভাবে শেষ, তাঁদের চোখ দিয়ে একবার দেখার চেষ্টা করবেন। এখন আমরা সামান্য খড়কুটো পেলেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে চলেছি। কেননা সামান্যতম আয়ের দরজা বন্ধ। অতিমারির কারণে স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বেড়েছে অনেকটাই। এই পরিস্থিতিতে সামান্য আর্থিক সাহায্য সঙ্গে একটু সামাজিক নিরাপত্তা আমাদের কাছে বড়ো উপকারের। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার ফায়দা তোলার চেষ্টা করে চলেছে। যা কিছু দেখা

যাচ্ছে, সবই ভোটমুখী। আগের দুয়ারে সরকার ছিল বিধানসভা নির্বাচনমুখী। এবারের লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচন।

কেন এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি? আসলে সাধারণ মানুষ যখন নানা কাজ নিয়ে সরকারি দপ্তরে যান, সেখানে একটা হয়রানি থাকেই। এই হয়রানির সঙ্গে থাকে কাটমানি, তোলাবাজি, সামান্য উৎকোচের বিষয়টাও। এখানে অনেকে বলতেই পারেন যে এর থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতেই পারেন এই কর্মসূচিতে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। ধরুন, আপনি রেশন কার্ডের জন্য আগে ভাগে একটা আবেদন করেছিলেন। এখনও পাননি। সেই আবেদনের নথি দেখাতে চাইলে, উত্তর মিলবে, আপনি অফিসে দেখা করুন, নয়তো-বা আপনাকে বলা হবে পরে পার্টি অফিসে এসে খবর নিয়ে যাবেন। এবার পার্টি অফিসে গেলে সামান্য পয়সা ভালোবেসে চাইলে, অপারগ হয়ে দিয়ে দেবেন আপনি। এবার আসা যাক, নানা ফর্ম বা আবেদন পাবার ব্যাপারে। এটিও নিয়ন্ত্রিত হয় ওই পার্টি অফিস থেকেই। সেখানে দলের অনুগতরা সুবিধা পান সবার আগে। তারপর পান অন্যরা। এক্ষেত্রেও ওই আবেদন পত্র পাবার জন্য যৎকিঞ্চিত দিতেও হয় পার্টির ঘরে। সেই হয়রানি থেকে সাধারণ মানুষের মনে একটা বিতৃষ্ণা জন্মায়। বিতৃষ্ণায় সরকারের থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নেয় সাধারণ মানুষ।

এবার আসা যাক এবারের দুয়ারে সরকারের কর্মসূচির বিষয়ে। গতবার এই কর্মসূচির ট্রাম্প কার্ড ছিল স্বাস্থ্যসাথী। এবারের দুটো কার্ড আছে। একটা হচ্ছে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, অন্যটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড।

গত কয়েকদিন ধরেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে এই দুটি বিষয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প আনার আগে মাননীয়া ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হচ্ছে মান্যতার মাপকাঠি। দেখা যাচ্ছে পরিবার পিছু মাত্র একজনই তাহলে সেই সুযোগ পাবেন। এরপর তিনি এই মান্যতার সঙ্গে জুড়ে দিলেন, পরিবারের সব মহিলাই এটা পাবার যোগ্য। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সঙ্গে থাকতে হবে আধার কার্ড আর অবশ্যই একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। অবশ্য পারিবারিক মাসিক আয়ের একটা ন্যূনতম মাত্রাও বেধে দিলেন। এই ন্যূনতম মাসিক আয়ের শংসাপত্র কার থেকে পাওয়া যাবে? সেক্ষেত্রেও সেই দলীয় মানুষজন নির্ভর হয়ে গেল সাধারণ মানুষ। তাঁদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে শংসাপত্র। এখানেও থাকছে একটা উৎকোচের পালা। সেখানেও চলছে সাধারণ মানুষের মধ্যে কে কতটা দলের অনুগত, সেটা দেখা, সঙ্গে তোলাবাজি। এতো গেল হালকা হালকা ভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে সার্থক করে তোলবার প্রচেষ্টা।

আর একটা প্রশ্ন আসছে। মানুষকে ভিক্ষা দিয়ে, ভিখারি করে তোলার এই উদ্যোগ

কেন? অন্য রাজ্যে তো এভাবে মানুষকে ভিখারি করে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না, বিকল্প আয়ের পথ সৃষ্টির মাধ্যমে পাশের রাজ্য ওড়িশা বা একটু দূরে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে তো সাধারণ মানুষের হাতে পয়সার জোগান দেবার চেষ্টা করছে সরকার। সরকার চেষ্টা করছে নানা ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির। আর আমাদের রাজ্যের সরকার, মানুষের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, মাসিক ৫০০ টাকা (সাধারণ) ও মাসিক ১০০০ টাকা (তপশিলিদের জন্য) ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে চলেছে। কোথা থেকে এই অর্থের জোগান আসবে সেটা কিন্তু আমাদের রাজ্যের সরকার জানায়নি। এই বিপুল পরিমাণ টাকার বাৎসরিক একটা রেকারিং খরচের জোগান রাখতে হবে সরকারকে। সেক্ষেত্রে বাজেটে সংস্থানেও বিষয়টাকে রাখতে হবে। সেটা কীভাবে রাখবে সরকার।

প্রসঙ্গত, সরকারি আধিকারিকদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা প্রয়োজন মনে করছি। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সব প্রাপকরা নিয়মিত পান তো? মাননীয়া একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন প্রকৃত অবস্থাটা কী? যাক ফিরে আসা যাক আগের প্রসঙ্গে। এই টাকা দিয়ে কি মাঝারি বা ক্ষুদ্র অথবা বাড়ির মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কোনো প্রকল্প নেওয়া যেত না? যেখানে বাড়ির মহিলারা বাড়িতে বসেই, অবসরে বা বাড়ির কাজের ফাঁকে সেই কাজ করে আয় করতে পারতেন। সরকারি ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করে সেই নিশ্চয়তা কি দেওয়া যেত না? এক্ষেত্রে অনেকটাই সম্মান দেখানো যেত বাড়ির মা, বোন, স্ত্রীদের। তাঁদের পাগলের মতো ভোররাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে, হুড়োহুড়ির মধ্যে পদপিষ্ট হতে হতো না। এই দুর্ঘটনার ছবি তো সবাই দেখেছেন সংবাদমাধ্যমে। এই অসম্মান করার অধিকার কে আপনাদের দিল? এই প্রশ্ন সরকারের কাছে তোলা প্রাসঙ্গিক নয় কি? আরেকটি কথা বলা দরকার। এই ভাতার টাকা ব্যাঙ্কে যাবে সরাসরি। তাহলে দরকার একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা। কিন্তু জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না সব ব্যাঙ্কে। একটা ন্যূনতম টাকা দিয়ে খুলতে হবে হিসাবের খাতা। তারপর মাসিক একটা ব্যালেন্স রাখতেই হবে। সেটিও খুব একটা কম নয়। সাধারণ অনেক মানুষের হাতেই ওই পরিমাণ টাকা এই মুহূর্তে নেই। কেননা এই আর্থিক পরিস্থিতিতে যার কাছে টাকা আছে সেই তাহলে এই সুযোগের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলাই বাহুল্য। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যে তিমিরে ছিল, সেখানেই থাকবে। এটাই বাস্তব।

এবার আসা যাক স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে। ইতিমধ্যেই সরকারের একটা সূত্র মারফত জানা গেছে, যে বিপুল পরিমাণ আবেদন পত্র জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ব্যাঙ্কের শর্ত পূরণ করতে না পারার কারণে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে প্রায় সিংহ ভাগ। কী সেই অন্তর্নিহিত শর্ত। তা কিন্তু সরকার প্রকল্প ঘোষণার সময়ে প্রকাশ করেননি। সরকার গ্যারেন্টার হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে, ভালো উদ্যোগ। এমনকী সামান্য সুদ ঋণগ্রহীতাকে দিতে হবে, এই পর্যন্তও ঠিক আছে। আবার ঋণশোধের সময়সীমা, সেটাও ঠিক আছে। তাহলে যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা মাননীয়া আপনার কথামতো আবেদন করল, স্বপ্ন দেখতে শুরু করল, পরে যখন তারা জানতে পারবেন যে তাঁদের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে, সেটা কি খুব ভালো দেখাবে? এই ভাবে ছোট্ট ছোট্ট ভবিষ্যতের নাগরিকদের স্বপ্ন নিয়ে খেলা করার অধিকারও আপনাকে কেউ দেয়নি। আপনি মনে যা আসে তাই করেন। এটা আপনার একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। আপনি সমাজের মানুষকে ভিখারির মতো করে, তাঁদের নানা কথায় অপমানিত করতেও ছাড়েন না। যদি বলতেন ভিক্ষা নয়, হাতে হাতে কাজ তুলে দিচ্ছি, ভাঁওতাবাজির কথা নয়, প্রকৃত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে দিচ্ছি তাহলে স্যালুট করতে দ্বিধা বোধ করব না। কিন্তু আবারও বলছি, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে, আপনি সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হয়েছেন। নির্বাচিত করেছে সাধারণ মানুষ। তাই বলে তাঁদের অসম্মানিত বা অপমান করার বা ভিখারি বানাবার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি। □

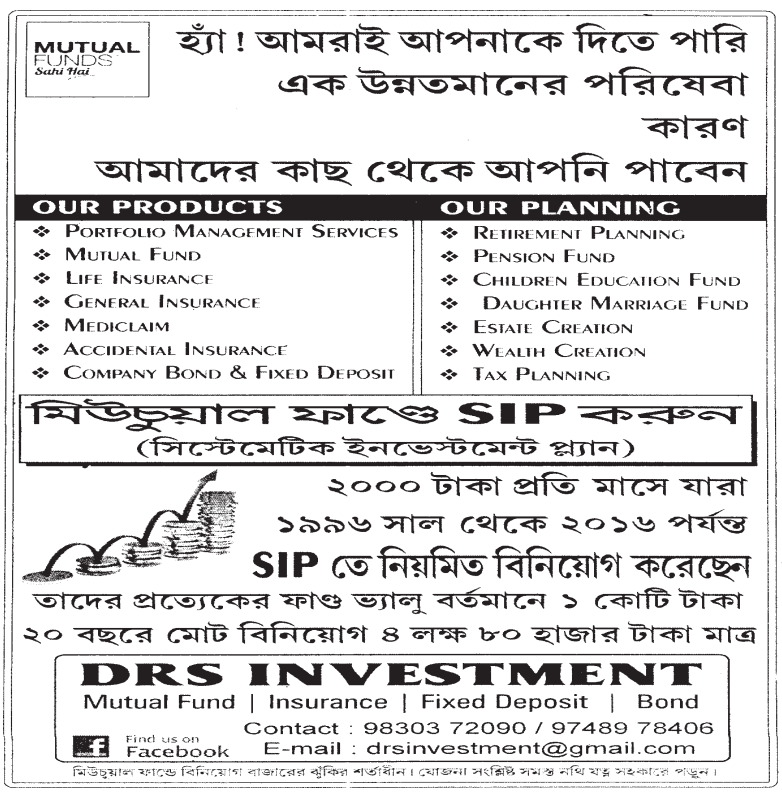

চার মহীরুহের ছায়ায়

অনামিকা দে

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, চশমার কাঁচের ওপারের মানুষগুলোও সব অচেনা। তাও ওই একটি নাম 'স্বস্তিকা' যা মনের গহন থেকে স্মৃতিগুলোকে সব নতুন করে রাঙিয়ে দিয়ে গেল। সালটা ১৯৪২, প্রথম খাঁকি হাফ প্যান্ট পরে বাড়ির পাশের মাঠে শাখা করতে যাওয়া। ১৮ বছর বয়সে শুরু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে পথ চলা, আজ বয়স ৯৮। নিজেকে স্বয়ংসেবক হিসেবে পরিচয় দিতেই সব থেকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা মানুষটি হলেন সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, আরএসএস-এর হুগলি বিভাগ সঙ্ঘচালক হিসেবে শেষ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। গত ৭ আগস্ট ২০২১, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দিল স্বস্তিকা ডিজিটাল। ছোটো ভাই সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রচারক ও পরবর্তীতে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি।

প্রদীপ ঘোষ মালদার বরেন্দ্র মহকুমার সঙ্ঘচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর হাতে স্বস্তিকা ডিজিটালের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হলো ৭ আগস্ট, ২০২১। প্রদীপদার কথায় ৭৫-এর ১৫ আগস্ট নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন অখণ্ড ভারত মাতার সন্তান হিসেবে।

'গুরুজী বাড়িতে এলে ওই ঘরটিতে থাকতেন'— ৮৭ বছরের জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী বলে চলেছেন স্মৃতির মণিকোঠা থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ছিলেন তিনি। ১১ আগস্ট ২০২১ স্বস্তিকা ডিজিটালের পক্ষ থেকে স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হলো জ্যোর্তিময় চক্রবর্তীর হাতে।

২০ আগস্ট ২০২১ স্বস্তিকা ডিজিটাল স্মারক সম্মান তুলে দিল রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। আরএসএস-এর পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক-এর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্ঘ জীবনের অনেক উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করলেন যা স্বস্তিকা ডিজিটালের ক্যামেরাবন্দি হলো সেদিন।